# ত্রিপুরার লুসাই কুকিদের ইতিকথা

গবেষণা অধিকার
উপজাতি ও তপশীলি জাতি কল্যাণ বিভাগ
ত্রিপুরা সরকার
১৯৮০ ইং।

প্রকাশক ঃ-
গবেষণা অধিকার
উপজাতি ও তপশীলি জাতি কল্যাণ বিভাগ
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা

মুদ্রণে
**ক্যুইক প্রিন্ট**
১১, জগন্নাথ বাড়ী রোড, আগরতলা ।

**মূল্য ঃ ৩৯ টাকা**

শ্রী রমাপ্রসাদ দত্তের গবেষণামূলক লেখ্য -- "লুসাই কুকিদের ইতিকথা" বইটি ত্রিপুরার গবেষণা অধিকার থেকে প্রকাশ করা হল । শ্রীদত্ত নিজে একজন গবেষক ও সাহিত্যিক । তিনি বহুদিন যাবৎ ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন । তিনি এই বইটিতে লুসাইদের সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন । শ্রীদত্ত এই বইটি লিখতে গিয়ে যে গবেষণাপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে শ্রমসাধ্য ব্যাপার ।

গবেষণা অধিকার থেকে উপজাতিদের বিষয়ে অনেক বই প্রকাশ করা হয়েছে । এই বইটি তার মধ্যে আর একটি সংযোজন যা সুধী ব্যক্তিদের উপকারে আসবে বলে আমরা মনে করি । ইতি --

অধিকর্তা

**গবেষণা অধিকার**

ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা ।

# ত্রিপুরার লুসাই কুকিদের ইতিকথা

ত্রিপুরার কয়েক হাজার পাহাড়ী লোক রয়েছে যাদের ভাষা তিপ্রাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং যারা কুকি ও লুসাই নামে পরিচিত। তারা কুকি নামে আখ্যাত হয়েছে সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা। সেকালের সমতলবাসীরা সেই সব পাহাড়ীদেরই 'কুকি' বলে অভিহিত করতো যাদের ভাষা তারা বুঝতো না, বা যাদেরকে তারা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ও মিত্র ভাবাপন্ন নয় বলে মনে করতো।

কুকি নামটি নেহাত আধুনিক নয় । খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত গ্রন্থ 'রাজমালা'র প্রথম লহরে 'কুকি' নামের উল্লেখ আছে । ত্রিপুরার রাজ বংশীয়দের অধিকৃত হওয়ার পূর্বে ত্রিপুরা অঞ্চল বিভিন্ন শাখার কিরাতদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল । এই কিরাত জনেরাই পরবর্তীকালে কুকি নামে আখ্যাত হয়েছে । ত্রিপুরার রাজা হিমতি (হামতারকা বা যুঝারকা) যখন রাঙ্গামাটি (গোমতী নদীর তীরবর্তী ভূ-ভাগ) অধিকার করতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর অগ্রগামী সেনাদলে ছিল কুকিরা । রাজার বশ্যতা স্বীকারের পর কুকিদের মধ্যে যারা তিপ্রাদের দ্বারা বিশেষভবে প্রভাবিত হয়েছে, ত্রিপুরায় তারাই পরিচিত হয়েছে হালাম নামে । ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অসমীয়া ভাষায় রচিত গ্রন্থ ত্রিপুরা বুরঞ্জীতেও একথার সমর্থন মিলে । ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজা রুদ্রসিংহের দরবার থেকে রাজার অধিকারভুক্ত রাঙ্গ রুঙ্গ (১) পাহাড়ে এসে যাদের দেখেছিলেন তাদেরকে কুকি ও হালাম বলেছেন (২) প্রাচীনকালে কুকিরা বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ত্রিপুরার রাজাকে বার্ষিক ভেট এনে দিত এবং সেই ভেটই কররূপে গৃহীত হতো । কি কি দিতে হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না । সাধারণতঃ তারা এনে দিত নিজেদের তৈরী নানা রকমের কাপড়, লোহা, পিতল ও বাঁশের তৈরী জিনিষ, হাতীর দাঁত, ঘোড়া নানা প্রকার বন্য জন্তু । (৩) এছাড়া কুকিরা রাজকরের বিনিময়ে বৎসরে ছয়দিন সোনার খনিতে ও রেশমের কারখানায় কাজ করতে বাধ্য ছিল । সরকারী হাতী খেদার কার্যেও তাদের উপস্থিত থাকতে হত ।

পার্বত অঞ্চলে সরকারী সংবাদ প্রচার করা, রাজকর্মচারীরা পার্বত্য অঞ্চলে গেলে তাদের জিনিষ পত্র এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে বয়ে নিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজও তাদের কর্তব্য ছিল । এইসব কারণেই তারা মুক্ত ছিল করের দায় থেকে । পরে কখন এই 'কুকি'দের উপর ঘর চুক্তি কর ধার্য্য হয়েছে তা জানা যায় না, শুধু জানতে পাই ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে কুকি'দের উপর ঘর চুক্তি খাজনা (Family tax) ছিল ৫।। (পাঁচ টাকা আট আনা) । তখন 'হালাম' নামে পরিচিতেরা এই কর দিত প্রতি পরিবারের জন্য ২ টাকা হারে ।

কুকি নামে আখ্যাত জনেরা কিন্তু নিজেদের কুকি বলে পরিচয় দেয় না । যে সব নামে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে, সে সব নামের উৎপত্তি সাধারণতঃ তাদের প্রধান বা বিখ্যাত দলপতির নাম থেকে । 'ককবরক' বা তিপ্রা ভাষায় 'কুকি'দের বলা হয় 'ছিকাম' । মণিপুরী ভাষায় বলে হাউ । কুকি ভাষাতেও 'কুকি'র প্রতিশব্দ রয়েছে- তারা বলে 'হায়েম' ।

লুসাই নামটি ত্রিপুরায় প্রচলিত হতে থাকে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে । অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ত্রিপুরার ইন্দ্রমাণিক্য যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে পরিবারবর্গসহ পূর্ব কূলে পাঠিয়ে নিজে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন নবাবের দরবারে । কৃষ্ণমণির পূর্বকূলে (৪) অবস্থান কালেই লুসাই ও খুচুং কুকিরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল । (৫) লুসাই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের ত্রিপুরা রাজ্যের সেনসাস বিবরণীতে বলা হয়েছে, কাছারিগণ ইহাদিগকে লুছাই বলিত, এই 'লুছাই' শব্দ এখন লুসাইরূপে পরিণত হইয়াছে । কাছাড়ীদের প্রদত্ত 'লুছাই' নাম অর্থ ব্যঞ্জক, 'লু' অর্থ মাথা আর ছাই অর্থ কাটা । যাহারা মাথা কাটে তাহারাই 'লুছাই' ।

শব্দটির উক্তরূপ বুৎপত্তির কথাই বলেছেন ।

"Hill Tracts of chittagong and the dwellers therrin" গ্রন্থের প্রণেতা T. H. L. win সাহেব । কিন্তু The Lushai Kuki clan গ্রন্থের প্রণেতা লেঃ কর্ণেল সেকসপীয়ারের অভিমত ভিন্নরূপ তিনি লিখেছেন ঃ—

This of course, is a mistake, as the clan is not Lushai, but Lushai, and though 'sha' means 'to cut' it does not mean 'to cut off' and could not be used of cutting a man's head's,

তিনি আরও বলেছেন যে, নরমুণ্ড শিকার এই সব পাহাড়িয়াদের চিরাচরিত প্রথা এরূপ বদ্ধমূল ধারণা থেকেই উদ্ভব হয়েছে এই ভুল

ব্যুৎপত্তির । কেবল মুণ্ড সংগ্রহের উদ্দেশ্যই 'লুসেই'রা কোন গ্রাম আক্রমণ করতো, একথা ঠিক নয়, তারা আক্রমণ করত লুণ্ঠন ও দাসদাসী সংগ্রহের জন্য । অবশ্য যে ব্যক্তি যুদ্ধে শত্রু সংহারে সমর্থ হত, সমাজে সাধারণের নিকট তার কৃতিত্বও স্বীকৃত হত, তাই সে নিয়ে আসতো নিহতের মুন্ড তার কৃতিত্বের নিদর্শন । হত্যা ও মুণ্ড সংগ্রহটা ছিল আনুষঙ্গিক ব্যাপার, মূল কারণ কখনও নয় । এদের চীফদের মৃত্যুতে অন্তেষ্টি ক্রিয়ায় নরমুণ্ডের প্রয়োজন বলে তা সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে লোক পাঠান হত এই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস । কিন্তু তা লুসেইদের বেলায় প্রযোজ্য নয় । থাদোদের মধ্যে প্রচলিত প্রথাকেই ভুল করে লুসেইদের বলে ধরে নেয়া হয়েছে ।

'লুসাই' শব্দটি বর্তমান সময়ে ব্যাপক অর্থ বহন করছে । 'লুসাই' বলতে এখন বহু পরিবারের লোকদের বুঝিয়ে থাকে । 'লুসেই' শব্দটির ভুল Transliteration-এর ফলেই 'লুসাই' শব্দ সৃষ্টি হয়েছে, 'লুসেই' হল বংশের নাম । এই বংশ থঙ্গুর, পছুআও ছংতে, ছোংতে, ছোআছেং প্রভৃতি অনেক পরিবারে বিভক্ত । প্রত্যেক পরিবারেও রয়েছে বেশ কয়েকটি করে শাখা ।

লুসাই চীফরা সবাই নিজেদের থঙ্গুরার বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে তাকে । কথিত আছে থঙ্গুরার জন্ম হয় এক বন্যি যুবক ও এক পইতে নারীর মিলনের ফলে ।৬) কিন্তু 'পইতেরা' বলে যে, পইতে চীফ উণ্ডকার (Ngehguka) এক অবৈধ পুত্র বোক্‌লুআ (BOKLUa)র বংশধর হল 'লুসাই'রা । 'থাদোর'র বলে যে, কয়েকজন শিকারী শিকারে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল একটি হরিণী স্তন্যদান করছে একটি মানব শিশুকে । সেই শিশুটিই পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছে থঙ্গুরা নামে ।

থঙ্গুরার আদিগ্রাম ছিল ফলমের (Falam) উত্তরে ত্‌লংকুআতে (Tlangkua) । থঙ্গুর নিজের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলেই আধিপত্য করছিলেন । পরে তাঁর থেকে প্রসারিত হয়েছে ছয়টি শাখা (১) রোকুম (Rokum) (২) জাদেং (Zadeng), (৩) থঙ্গুলুআ

(Thanghlua), (৪) পল্লিয়ান (pallian), (৫) রিবুং (Rivung) ও (৬) স্যাইলো (Sailo)।

থঙ্গুর পরিবারের বিভিন্ন শাখা প্রবল হয়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে তখন তাদের উত্তর দিকে সুকতে, পাইতে ও থাদোদের অধিকার ছিল। এরা ছিল নিজেদের দলপতিদের অধীনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পশ্চিমের পাহাড়গুলোতে বাস করছিল পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা সম্প্রদায়গুলো। ত্রিপুরায় এইরূপ দল বা সম্প্রদায়গুলোকে বলা হত 'দফা'। উপযুক্ত জন্মভূমির অভাবে বা পূর্বদিকের ভিন্ন বংশীয়দের চাপে পড়ে যখন থঙ্গুর পরিবারের বিভিন্ন শাখা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন তারা এই পশ্চিমদিক দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল। ছোট ছোট দফাগুলো সহজেই তাদের দ্বারা বিজিত ও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অথবা পালিয়ে গিয়েছে উত্তর ও পশ্চিম দিকে মণিপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায়। সে সব স্থানে তারা আখ্যাত হয়েছে 'কু কি' নামে। যারা থঙ্গুর বংশীয়দের অধীনে তাদেরই মধ্যে বাস করে তাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি গ্রহণ করেছে এবং সাধারণ চোখে আজ যাদের পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়ে না তারা হল — ছাওতে, ছঙ্গথু, নামতে, কাওলনি, কওলহ্রিং, কিয়ংতে, ডেন্‌তে, পওতু, রেন্‌তেলেই বোইতে, বঙ্গছিয়া, জংতে ইত্যাদি। এদের আবার শাখা প্রশাখা রয়েছে। আর যারা পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে লুসাইদের সান্নিধ্যে বাস করছে এবং লুসেইদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। তারা পরিচিত ফনই, বোলতে, পুইতে, রাংতে ইত্যাদি নামে। মণিপুরে পুরাণ কুকি বলে আখ্যাতদের নাম — আইমোল অনল, ছাওতে, ছিরু কোলহেন, কোম, নমগঙ্গ, পুরুম, টিথুপ ও তইপেন। কথিত আছে ছিরু ও অনল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এবং আইমোল ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে যেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, আর গিয়েছিল নাকি ত্রিপুরার পাহাড় থেকে। কাছাড়ের পুরান কুকি হল রাংছল, খেলমা বেতে (বিয়েতে বা বিয়াতেও বলা হয়) প্রভৃতিরা। পুরাণ কুকিরা কাছাড়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে।

অসংখ্য পরিবার ও সাখা সমন্বিত 'থাদো'দের বলা হয় নতুন কুকি । পুরাণ কুকি (Khawilang) বা যখন থাদোদের অধিকৃত অঞ্চল দিয়ে পালাচ্ছিল, তখন থাদোদের হাতেও তাদের অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল । নতুন কুকি এবং তাদের সগোত্রীয়েরা কাছাড়ে গিয়ে উপস্থিত হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ।

১৩৪০ ত্রিপুরা সনের ত্রিপুরা রাজ্যের সেনসাস বিবরণীতে বলা হয়েছে — পাইতু, বেলাঠুট, থাংলায়, লাইফং, বংখই, মিজেল, নামতে, ছাল্যা; কুন, কুনতেই, নেনতেই, জংতেই, বাংচন, বলতে, খরেং প্রভৃতি দফা বা সম্প্রদায়ের লোকেরা কুকি । কিন্তু প্রথম পাঁচটি দফার কুকিই এ রাজ্যে বাস করছে । এ রাজ্যের কুকিরা সাধারণতঃ ডারলং ও লুসাই নামে অভিহিত হয়ে থাকে ।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (১৩২৫ ত্রিপুরাব্দে) প্রকাশিত উকিল ব্রজগোপাল সিংহ প্রণীত 'মণিপুরী ও কুকি ভাষা শিক্ষার সহজ উপায়' পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে লিখিত হয়েছে চুটলাং, খচাক (লুছাই), ফাটলেই, ছনলেল, পাইতু, বলতে, বিয়েতে, টলাংতে খরেং, লুংটাউ বুওলতে, ঠিয়েক, পিয়েলতু, হালাম, খুচুং, হ্রাংখল এবং চরাই প্রভৃতি জাতীয় লোকের স্থূলতঃ কুকি ভাষাই মাতৃভাষা ।

ত্রিপুরার সেনসাসে যাদের 'হালাম' সম্প্রদায়ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে । এককালে তাদের মাতৃভাষা কুকি ভাষাই ছিল, কিন্তু আজ তারা প্রায় সবাই তিপ্রা ভাষাভাষী হয়ে পড়েছে । দীর্ঘকাল ধরে অধিক পরিমাণে তিপ্রাদের সংস্পর্শে আসার ফলেই এরূপ হয়েছে, যেমন করে বঙ্গ ভাষাভাষী হয়েছে কয়েক পুরুষ ধরে রাজধানীতে বসবাসকারী তিপ্রারা । হালামদের ফলই রূপিনী কুকি ভাষা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করেছে । রাংখল, মরছুম, কাইপেং, চড়ই, ডাব প্রভৃতিদের প্রায় একই অবস্থা ।

থঙ্গুর পরিবারের 'রোকুম' শাখাই প্রথমে অগ্রসর হয়েছিল আদি বাসস্থান ত্যাগ করে । তাদের পর জাদেঙ্গ (Zadeng)রা । পশ্চিমদিকে এগিয়ে আসে চম্পাইয়ের (Champoia), মধ্য

দিয়ে । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে (Tlong) বা ধলেশ্বরী (Dallswari) নদীর তীরে দরলুঙ্গ (Darlung) পাহাড়ে হাজার ঘর লোক নিয়ে চারটি গ্রামে তারা বাস করছিল । লালুল পরিবারে স্যাইলো চীফদের সহযোগিতায় এই জাদেঙ্গরা প্রথমে (Hualgno) দের পরাজিত করে । এই Hualgnoরাও ছিল লুসেই পরিবারেরই লোক । এরা বাস করতো নদীর মধ্যবর্তী স্থানে । এদের সাথে সংগ্রামে জাদেঙ্গের মিত্রপক্ষ ছিল পল্লিয়ানরা । কিন্তু জাদেঙ্গরা পরে পল্লিয়ানদেরও পরাজিত করে । তারপর জাদেঙ্গদের বিরোধ বাধে মঙ্গপুরার সাথে। মঙ্গপুরা ছিলেন তদানীন্তন স্যাইলো চীফদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । কিন্তু তিনি তখন মৃত্যুমুখে । তাই বিরোধের ভার গিয়ে পড়েছিল তাঁর আত্মীয়দের হাতে । সেই আত্মীয়দের একজন ছিলেন বুতাইয়া । বুতাইয়ার প্রবল পরাক্রমে জাদেঙ্গরা সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল দক্ষিণ দিকে । ১৮৫৭ সালে লুংলের নিকটের ১০০ ঘর প্রজা সমন্বিত তাদের শেষ স্বাধীন গ্রাম তেঙ্গপুই বিধ্বস্ত হয় ।

থাঙ্গলুয়া ও রিবুঙ্গরা ধরেছিল আরও দক্ষিণের পথ । শেষোক্ত শাখা প্রবেশ করছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে । তাদের এক চীফ থাঙ্গ (Vanhnuaithanga)র একটি বড় গ্রামে ছিল ছেঙ্গরি ও কাছলং নদীর মধ্যবর্তী লংতরাই (Longterai) পাহাড়ে । ১৮৫০ সালে বনু যাইর মৃত্যু হয় । তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরই গ্রামটি ধ্বংস হয় বুতাইয়ার আক্রমণে । অবশিষ্ট রিবুঙ্গরা পালিয়ে আসে ত্রিপুরার পাহাড়ে ।

থঙ্গলুয়া শাখা প্রবেশ করেছিল ডেমাগিরি ও বড়কুল (Barkhul) পর্যন্ত । সেখানে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন রতন পুইয়া। প্রথমে তিনি ছিলেন ইংরেজদের শত্রু পরে পরিণত হয়েছিলেন মিত্ররূপে। তাঁর পুত্র লালছেবা (Lalchheva) ইংরেজ আধিপত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর গ্রাম সরিয়ে নিয়ে যান বৃটিশ এলাকার বাইরে। কিছুকাল পরই তার সে গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় চীন দলপতি হাওসাত (Howsata) আক্রমণে। তাতে বহুলোক হতাহত হয়েছিল, ততোধিক নীত হয়েছিল বন্দীরূপে সঙ্গে পরাজিত দলপতি পরিধেয়

বস্ত্রমাত্র সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন।

পল্লিয়ান শাখা অগ্রসর হয়েছিল জাদেঙ্গদের পথ ধরে। তাদের বিখ্যাত চীফ ছিলেন সুবুতা ও লালছুকলা। সার আলেকজান্ডার ম্যাকঞ্জির N.E.F. Bangal গ্রন্থে বলা হয়েছে যে সীবুতা ২৫০০ ঘর প্রজা নিয়ে ত্রিপুরার রাজার অধিনতা পাশ ছিন্ন করেছিলেন। তার মৃত্যু হয়েছিল আইজলের অদূরে। তার প্রপৌত্র ছিলেন লালছুকলা, যাকে ধরে (১৮৪১) ক্যাঃ ব্লেকউডের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজার জনৈক সেনাপতি কেলি ফিরিঙ্গি। লালছুকলাকে দীপান্তরিত করা হয়েছিল। পল্লিয়ান চীফপুরকুরাও এক সময় খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তার সমসাময়িক থঙ্গুর পরিবারের অন্যান্য শাখার চীফদের কাছ থেকেও তিনি কর আদায় করতেন। Dungtlang এর সুবৃহৎ পল্লীতে তার প্রায় ৩ হাজার ঘর প্রজার বাস ছিল। সেখান থেকে তিনি পুকজিং (Pukzing) পর্যন্ত সরে যান। পুকজিংত তার গ্রাম বিধ্বস্ত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জাদেঙ্গ স্যাইলো ও চাক্‌মাদের মিলিত আক্রমণে। পুরবুরা তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধরেরা স্যাইলো পরিবারে রোলুরা (Rolura) শাখার চীফদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়ে থাকে।

স্যাইলো দলপতিরা ছিল থঙ্গুরার প্রপৌত স্যাইলোবা (Sailova) বংশধর। এরাই সবশেষ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। অধুনা লুসাই পাহাড় নামে পরিচিত সমগ্র অঞ্চলটির উপর। এই এদেরই সাথে বার বার সংঘর্ষ ঘটেছে সে কালের ইংরেজ সরকারের। চট্টগ্রাম সীমান্তে থাউলঙ্গেরা। যারা ইংরেজ সরকারের দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত। লালুলের (Lalul) বংশধরের যাদের কার্যকলাপের বিস্তর বিবরণ ছিল সেকালের শিলচরের সরকারী নথিপত্রে এবং বোনোলেল (Vonolel) সবুঙ্গ ও সঙ্গবুঙ্গ (Savunga and Sangvunga) প্রভৃতিরা। যাদের বিরুদ্ধে ১৮৭২ সালে লুসাই অভিযানে সৈন্যদল প্রেরিত হয়েছিল কাছাড় ও চট্টগ্রাম থেকে তারা সবাই স্যাইলো (Sailo)।

বর্তমান লুসাই পাহাড় বলতে যে অঞ্চলকে বুঝায়, এককালে তার প্রায় সবটাই ছিল সাধারণ ভাবে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত। কোর্ট অব ডিরেকটর্সের নির্দেশে ১৭৮১ সালে মেজর রেণেল কৃত মানচিত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্বসীমা আভা রাজ্যকে স্পর্শ করেছে। ১৮২১ সালে (১২৩২ ত্রিপুরাব্দের পৌষ মাসে) লেঃ ফিশার (Fisher) শ্রীহট্টের সীমা নির্দ্ধারণের কাজে এসেছিলেন। ত্রিপুরার উত্তর সীমারেখা ও শ্রীহট্টের দক্ষিণ সীমারেখা পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে। লেঃ ফিসার সেই সম্মিলিত সীমারেখা ধলেশ্বরী পর্যন্ত বিস্তৃত বলে নির্দ্ধারণ করেন। তখন শ্রীহট্টের পূর্ব সীমাও ছিল ধলেশ্বরী পর্যন্তই বিস্তৃত। ত্রিপুরার দরবার এই নির্দ্ধারণে আপত্তি জানালেন। বিষয়টি প্রথমে ব্রিটিশ আদালতে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু দুই রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ আদালতের এক্তিয়ার ভুক্ত নয় বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সালিসি বিচারে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মিঃ ইয়ুল ও ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে মিঃ ক্যাম্পবেলকে মনোনীত করা হয়। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কউল (Coull) কে করা হয় মধ্যস্থ। বিচারের ফলাফল প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালে। তাতে লেঃ ফিশারের নির্দ্ধারিত সীমানাই অনুমোদিত হয়। ধলেশ্বরী পূর্ব সীমাবলে উল্লেখ থাকায় তা ত্রিপুরার উত্তর পূর্ব কোন তো বটেই পূর্ব সীমা বলেও ধরে নেওয়া হয়।

১৮৮৭ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে এসিঃ পলিটিক্যাল এজেন্ট (১৩৬৬ নং সহায়) লিখেছিলেন.....

" From Mr. Tules report noted in the margin, it will be seen that formerly Dhaleswari river was understood to be the eastern boundary of the Maha raja's territory ... ... .. For administration and Political convenience, however, it was subsequenty found expedient to have the Longai as the eastern boundary of the state, and it was duly communicated to His Highness."

কাছাড় ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে যাবার পর ১৮৩৫ সালে ক্যাঃ পেম্বারটনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল সীমা নির্দ্ধারণের জন্য। তিনি নির্দ্ধারণ করেছিলেন টিপাই ও বরাকের সঙ্গমস্থলকে ত্রিপুরা, মণিপুর ও কাছারের সম্মিলিত সীমা বলে। গ্রন্থের ২৮৬ পৃষ্ঠায় আছে—

"In Pemberton's report we find that all the Lushai country was once considered to belong Tipperh"

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কাছাড় রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে কাছাড়ের বাউন্ডারী লাইনের দক্ষিণের ভূভাগ স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্ভূক্ত বলেই ধরা হয়েছে। স্যাকেঞ্জির উক্ত গ্রন্থে আছে—

"The southern extremity of the suddashur hills was the south east corner of Cachar. It would appear from this that the Narrow hill tract running down between the Hill Tipperah and Manipur and represented in our recent maps as part of Cachar was in pemberton's time considered to be part of Hill Tipperah."

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত Thointon's gazettur এর ৯৯৭ পৃষ্ঠায় আছে—

"Tipperah (independents-An extensive tract of Mountainous country bounded on the north by British district of Sylhet and Cachar, on the east by territory of Burmah, on the south by Burmah and Chittagong, and on the west by district of Tipperah contains a area of 7.632 Sq. miles."

১৮৬২ সালের Thuiller's ম্যাপেও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা

প্রদর্শিত হয়েছে কাছাড়ের পূর্ব সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ।

ত্রিপুরার সীমারেখা পূর্বদিকে ঐরূপ বিস্তৃত থাকাকালে ঐ অঞ্চল সাধারণভাবে 'কুকি' নামে পরিচিত বিভিন্ন পরিবারের পাহাড়ী লোকের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তাদেরই মধ্যে যে সব পরিবার যুদ্ধের কাজে বা সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত হয়ে, এবং তিপ্রাদের সাথে ঘনিষ্টতার ফলে বিবিধ বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে পড়তো তারাই আখ্যাত হতো 'হালাম' নামে।

সেকালে পূর্বাঞ্চলের পাহাড়িয়াগণ ত্রিপুরার রাজাকে ভীষণ ভয় করতো। লুসাইদের মধ্যে প্রচলিত গল্প দিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লুসাইরা ত্রিপুরার রাজাকে বলতো 'রেঙ্গপুই'। তারা বলতো রেঙ্গপুইয়ের সাথে যুদ্ধে কুম্পিণু ( কোম্পানী মতো অর্থাৎ স্বর্গীয়া কুইন ভিক্টোরিয়া) মোটেই সুবিধা করে উঠতে পারতেন না। সাহেবরা যাদ রেঙ্গপুইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতো তবে তাদের শস্য নষ্ট হতো এবং নানারূপ অসুখ বিসুখ দেখা দিতো। একদা পাথিয়েন ( লুসাইদের ঈশ্বর) আকাশ থেকে একটি কামান ফেলেছিলেন। কুম্পিনুর একদল সিপাহী অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে নাড়াতে পারেননি। কিন্তু রেঙ্গপুইয়ের অল্প কয়েকজন লোকই সেটা তুলে নিয়েছিল।

মগ ও মুসলমানদের বার বার আক্রমণের এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলে ত্রিপুরার রাজশক্তি বিশেষ খর্ব হয়ে পড়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সময়ই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল নিবাসী এই সব দুর্ধর্ষ উপজাতীয় লোকের মাথা তোলার সুযোগ লাভ করে। এদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তি কতকটা উদ্দীপিত হয়েছে ত্রিপুরার রাজবংশীয়দের দ্বারাই। সিংহাসনের দাবী নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হলেই দুর্বল পক্ষ প্রায়শঃ গিয়ে আশ্রয় নিতো এই সব পাহাড়িদের মধ্যে। তারপর তাদের নিয়ে লুটতরাজ চালাতেন রাজ্যের অভ্যন্তরে ও রাজ্যের বাইরে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রুদ্রমণি যুবা ( যিনি জয়মাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন) এদের সাহায্য নিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শম্ভুঠাকুর যুদ্ধ চালিয়েছিলেন কাইফেং হালাম ও জংতে কুকিদের নিয়ে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজবংশীয় রামকানু ঠাকুর

কয়েকশত কুকি নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন খণ্ডলের মেরকুচৌধুরীর বাড়ী। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজবংশীয় ভগবান ঠাকুরও খণ্ডলের একটি গ্রাম লুঠ করেছিলেন।

ইংরেজ গভর্ণমেন্টের নথিপত্রে কুকি উৎখাতের কথা প্রথম লিপি হয় ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে চট্টগ্রাম সীমান্তে কুকি উৎপাতের কথা উল্লেখ করে চট্টগ্রামের চীফ আবেদন জানিয়েছিলেন, যেন একদল সৈন্য পাঠিয়ে সেখানকার প্রজাদের রক্ষা করা হয় কুকিদের আক্রমণ থেকে ।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে খুচং কুকি এসে ত্রিপুরার রাজাকে নালিশ জানায় যে লুসাইরা তাদের পল্লী আক্রমণ করে বহু লোককে হতাহত করেছে। ত্রিপুরার রাজা সসৈন্যে দয়ারাম সেনাপতিকে লুসাই দমনে প্রেরণ করেন। দয়ারামের পরাক্রমে যুদ্ধে সতের শত লুসাই নিহত হয়েছিল এবং অন্যেরা ভয়ে গভীর অরন্যে পালিয়ে গিয়েছিল বলে রাজমালায় উল্লেখ আছে।

কুকিরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে ত্রিপুরার পূর্বকূলের অনেক হালাম প্রজা পালিয়ে গিয়েছিল কাছাড় রাজ্যে। পরে অবশ্য আবার তারা দেশে ফিরে আসতে চায়, কিন্তু রাজমালা বলছে হেড়ম্বরাজ তাদের বাধা দিয়ে নিজের রাজ্যেই রেখে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে হেড়ম্বরাজকে পত্র লিখেও কোন ফল না হওয়ায় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার সৈন্য সহ দীননাথ ছাদিয়ালকে হেড়ম্বরাজ্যে পাঠানো হয় পূর্বকূলের সেই হালাম প্রজাদের নিয়ে আসতে।

"ছাকাচের খামাচের বাংখল রুপনি
বাঙ্গরোঙ্গ বন্য দফা হালাম তখনি।
পাঁচশত ঘর হালাম হেড়ম্ব হইতে
ছাদিয়াল আনি ছিল বিক্রম বলেতে

*রাজমালা।*

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীহট্টের একদল কাঠুরে আক্রান্ত হয় বুতাইয়ের দ্বারা। ধলেশ্বরীর দশমাইল পশ্চিমে সিমলা নদীর তীরবর্ত্তী পাহাড়ে ছিল বুতাইয়ের বাস। ম্যাজিষ্ট্রেট লোক পাঠালেন, তাতে জানা গিয়েছিল যে, প্রতাপগড়ের জমিদার বার্ষিক যে ভেট পাঠাতেন তা বন্ধ করা হয়েছিল বলেই একাজ করা হয়েছে। প্রেরিত লোকদের দু'জনকে আট্‌কে রেখে, তৃতীয় জনকে এক বীভৎস দৃশ্য সেই কাঠুরেদের কর্ত্তিত মুন্ড দেখিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আটক ব্যক্তিদের মুক্তি মূল্য নিয়ে আসতে। নিরুপায় সরকার সেই হতভাগ্য বন্দীদের রক্ষার জন্য মুক্তি মূল্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে আদেশ ও প্রচার করেছিলেন কুকিদের জন্য হাট বন্ধ করে দেওয়াবুর তাইয়ের গ্রামে শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় সৈন্যদল পাঠালেও স্থির করা হয়েছিল এবং একাজে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল ত্রিপুরার রাজাকেও। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হয়নি।

পাইতুদের চীফলারো ছিলেন খুবই পরাক্রমশালী। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁর মৃত্যু হয়। লালছুক্‌লা ও বুতাইয়া ছিলেন তাঁর আত্মীয়।

১৬ই এপ্রিল রাত্রে তারা শ্রীহট্টের প্রতাপগড়ের কোচবাড়ি (Kochabari) নামক মণিপুরী বস্‌তি আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ২০ জন নিহত ও ৬ (ছয়) জন বন্দীরূপে নীত হয়েছিল। ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ত্রিপুরার রাজাকে নির্দেশ পাঠালেন যে ১লা, ডিসেম্বরের পূর্বেই কথা চালাচালি করে অথবা বলপ্রয়োগ করে অপরাধীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করাতে হবে । অন্যথায় ইংরেজ সৈন্যদল, পার্বত্য পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় অরণ্যাঞ্চলে প্রবেশ করবে এবং যেখান থেকেই হোক অপরাধীদের খুঁজে বার করবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ত্রিপুরার রাজা প্রথমে ২৭ জন কুকিকে এবং পরে বুতাইকে ধরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সবাই এ বিষয়ে কিছুই না জানার কথা বলায়, তাদের কথায় বিশ্বাস করে বা পিটুনী অভিযান চালানোই শ্রেয় বিবেচনা করে শাস্তি ব্যবস্থায় ক্যাপ্টেন ব্লেকউড়ের অধীনে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীহট্টের সৈন্যদল প্রেরণ করা

হয়। লালছুক্‌লার গ্রাম অবরোধ করা হলে ৪ঠা ডিসেম্বর লালছুক্‌লা ক্যাঃ ব্লেকউড়ের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কৈলাস চন্দ্র সিংহ তাঁর রাজমালায় লিখেছেন যে, ত্রিপুরার রাজার জনৈক সেনাপতি (কেলিফিরিঙ্গী) লালছুক্‌লা ধরে ব্লেকউড়ের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। লালছুক্‌লা স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি মণিপুরীদের উপর আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তারা ইংরেজ সরকারের প্রজা তা তিনি জানতেন না। লালছুক্‌লা বলেছিলেন যে, তাঁর আক্রমণের কারণ ছিল তাঁর পিতা লারো যখন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্য এই পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার যে ক্ষতি করেছিলেন রামসিং ও ত্রিভুবন সিং তারই প্রতিশোধ নিতে চালানো হয়েছিল এই আক্রমণ। কিন্তু ইংরেজ সরকার লালছুক্‌লাকে ক্ষমা করেননি। বিচারে তিনি দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন। প্রমাণাভাবে বুতাইয়াকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মণিপুরের অধীন থাদোরা আক্রমণ করেছিল কাছাড়ের একটি কুকি গ্রাম। তাতে আটজন নিহত হয়েছিল।

১৮৪৭ সালে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট লুসাইদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মণিপুরের অধীন চাঙ্গসেল ও অন্যান্য কুকিদের সাথে দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাতে দুই তিনশত জন নিহত ও অপহৃত হয়েছে। লুসাইদের সাথে বর্মিপোষাক পরিহিত ও বন্দুকধারী অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকদের সংগ্রামে অংশ গ্রহণের কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। (৭) তিনি লিখেছিলেন যে, কোন উপজাতি দলই এদের প্রতিরোধ করতে পারে না, কোন সেনা— চৌকিও এদের আক্রমণ থেকে মণিপুরকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যেহেতু ঐসব আক্রমণকারীরা পার্বত্য ত্রিপুরার আধিবাসী, সুতরাং সেখান থেকেই তাদের নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

এ বিষয়ে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ত্রিপুরার রাজার বক্তব্য জানতে চান। ত্রিপুরার রাজা উত্তরে জানান যে আক্রমণের কথা তিনি শুনেছেন, কিন্তু আক্রমণকারীরা তাঁর প্রজা নয় বলে তিনি ততোধিক

কোন সংবাদ রাখেন না ।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গভর্ণমেন্ট খবর পেলেন শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে যে, কুকিদের আক্রমণে ব্রিটিশ এলাকায় প্রায় দেড়শত লোক নিহত হয়েছে। এদিকে ত্রিপুরার রাজাও জানিয়েছেন আক্রমণটা ঘটেছে তারই অভ্যন্তরে। তাই-এ ব্যাপারে যেন শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ না করেন। শ্রীহট্ট থেকে আপত্তি জানানো হয় যে Capt, Fisher এর নির্দ্ধারিত জেলার সীমানা অনুযায়ী ঘটনাস্থল ব্রিটিশ এলাকাতেই পড়ে। তদনুযায়ী শ্রীহট্ট থেকে সৈন্যদলও পাঠানো হয়েছিল পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের পাহারায় । পরে অবশ্য অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছিল যে ফিশার নির্দ্ধারিত সীমারেখা ঘটনা স্থলের অনেক উত্তরে । তখন আর কিছু না বলে সৈন্য দলে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট সিমনা নদীর তীরে ব্রিটিশ এলাকায় আরও একটি কুকি আক্রমণের সংবাদ পান। কাঠ কেটে ফেরার পথে আক্রান্ত হয়েছে হালামদের একটি পাড়া। আর একটি পাড়াও হয়েছে লুণ্ঠিত। N.F. Fronter of Bengal গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আক্রমণকারীরা ছিল ত্রিপুরার প্রজা Khojawal ehief এর লোক ।

ঠিক এই সময়েই কাছাড় থেকেও ইংরেজ গভর্ণমেন্ট খবর পান, লালিংবুং (Laling boong) রাজার অধীন লুসাই কুকিরা শিলচরের দশ মাইল দক্ষিণস্থ এক কুকি গ্রাম আক্রমণ করে ২৯ জনকে হত্যা করেছে এবং ৪২ জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তারপর আক্রমণকারীরা লিলং (Leelong) রাজার গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কুকি বসতি লুঠ করে ও জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যায়।

এবার ইংরেজ গভর্ণমেন্ট স্থির করলেন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের। ত্রিপুরার রাজাকে বলা হল অপরাধী চীফ্ ও তাঁদের অনুচরদের ধরে দিতে, আর বন্দীদের প্রত্যর্পণে বাধ্য করতে। যদি তিনি তা করতে অসমর্থ হন, তা হলে তার রাজ্যে সৈন্যদল প্রবেশ

করবে । কারণ এ ধরণের হত্যাকান্ড ও লুঠতরাজের জন্য উপযুক্ত শাস্তি প্রদান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে সব ব্যবস্থা ভার পড়লো শ্রীহট্টের লাইট ইনফেন্ট্রির কম্যান্ডেন্ট ও খাসি পাহাড়ের এজেন্ট কর্ণেল লিষ্টারের উপর। তাঁর উপর নির্দেশ দেয়া ছিল যে, শ্রীহট্টের আক্রমণের ঘটনাস্থল বিষয়ে ত্রিপুরার রাজার দাবি দ্বারা যেন তিনি প্রভাবিত না হন।

গ্রন্থের ২৯২ পৃষ্ঠায় আছে —

"If it was defacto in our posession and rent paid us for it, he was to proceed to ascertain the guilty tribes, and punish them if possible."

অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছিল, শ্রীহট্টের দিককার ঘটনাস্থলটি ব্রিটিশ এলাকার অভ্যন্তরে এবং কাছাড় থেকেও নিশ্চিত করে বলা হয় যে, কাছাড় ও শ্রীহট্টের আক্রমণকারীরা লুসাই। লালিংবুঙ্গ তাঁর দুই পুত্র বরমোলাল ও লালপোরকে পাঠিয়েছিলেন পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে লুঠতারাজের জন্য । মিত্র ভাবাপন্ন কুকিদের মারফৎ খোঁজ নিল শ্রীহট্টের ম্যাজিস্ট্রেটও জানিয়েছিলেন যে, আক্রমণকারীরা হল ছাতার ছড়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে দুই দিনের পথ দূরে অবস্থানকারী খোজবাল বা খচাকদেরই একটি দল-লালিংবুং ও সুকপিলালের (৮) প্রজা।

কাছাড়া থেকে যাত্রার জন্য সৈন্যদলের প্রস্তুতি যখন চলছিল, তখন (১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী) একটি আক্রমণ হয় শ্রীহট্টের লাটথানা এলাকায়। স্থানটির অধিকার নিয়ে ত্রিপুরার রাজা ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে তখন বিতর্ক চলছিল। প্রথমে ঘটনাটি পূর্ব্বের উৎপাতকারীদের বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ঘটনাটি পূর্ব্বের উৎপাতকারীদের বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী রিপোর্টগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাদের জড়িত করা হয়। অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন অনুসন্ধান নেওয়া হয়নি।

কর্ণেল লিষ্টারের সৈন্যদল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা, জানুয়ারী তারিখে যাত্রা করেছিল শিলচর থেকে। ১৪ই, জানুয়ারী গিয়ে উপস্থিত হয় মুল্লার গ্রামে । গ্রামটিতে তখন প্রায় হাজার ঘর প্রজার বসতি ছিল, এবং ধান, কার্পাস ইত্যাদি সঞ্চিত ছিল প্রচুর পরিমাণে। বিশেষ তৎপরতার সাথে সেগুলি সরিয়ে নিয়ে তারা ১৬ই, জানুয়ারী গ্রামটিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যায়।

কাছাড়ের দক্ষিণে পাহাড় অঞ্চলে প্রধানতঃ খাদোরাই জুম করতো। তাদের অধিকাংশই ইংরেজ শাসিত অঞ্চলে গিয়েছিল লুসাইদের ভয়ে। অন্যেরা দক্ষিণে নীত হয়েছিল, এবং বাধ্য হয়েছিল লুসাইদের হয়ে জুম চাষ করতে। কর্ণেল লিষ্টারের আগমনে তাদের অনেকেই এই অভিপ্রেত সম্বন্ধ থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। লুসাইরা এ ক্ষতির প্রতিশোধ না নিয়ে থাকেনি। কর্ণেল লিষ্টার মুল্লা ছেড়ে চলে যাবার পর লুসাইরা তাদের সাথে বসবাসকারী ২০ জন খাদোরাইকে কেটেছিল। কয়েকজন অবশ্য পালিয়েও রক্ষা পেয়েছিল।

কর্ণেল লিষ্টারের প্রস্তাব ছিল কুকি লেভি গঠনের এবং শিলচর থেকে একটি রাস্তা তৈরী করানোর । সে প্রস্তাব গৃহীতও হয়েছিল। কাছাড়ের সুপারিন্টেডেন্ট চেয়েছিলেন, কুকি ও অন্যান্য পাহাড়িদের জেলার দক্ষিণে বসতি করিয়ে জেলার আবাদি অঞ্চলে যাতে লুসাই আক্রমণ বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করতে। এই উদ্দেশ্যে সেই সব পাহাড়িয়াদের হাতে অস্ত্র দেওয়ার এবং সাহায্য দেওয়ার কথাও হয়েছিল। পশ্চিমের কুকিরা তাতে সম্মত হয়নি।

২০০ লোক নিয়ে কুকি লেভি গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু স্থির হয়েছিল এই লেভির অর্দ্ধেক মাত্র থাকবে কুকি আর বাকী অর্দ্ধেক লোক নেওয়া হবে কাছাড়ী ও অন্যান্য বিশ্বস্ত জাতি থেকে। শুধু কুকিদের নিয়ে লেভি গঠনে সাহস পাননি ইংরেজ সরকার।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লুসাইরা ইংরেজ গভর্ণমেন্টের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠায় সুকপিলারের একজন মন্ত্রী এবং বড় মোঈলিন (Barmooeelin) বুতাই লঙ্গরো।

লঙ্গরো (Langroo) ও লালপো (Lalpoo) দূতেরা শিলচরে গিয়েছিল আলোচনার জন্য। স্বল্প আলোচনার পর তারা তাদের চীফদের নিয়ে আসতে স্বীকৃত হয়। তারা একথাও জানায় যে, ইংরেজ সরকারের রক্ষনাধীনে এসে তারা প্রজারূপে বাস করতে ইচ্ছুক। কারণ দক্ষিণে পোঈই ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে আসায় তারা শংকিত হয়ে উঠছে। এককালে ঐ পোঈদের তারা কর দিতো এবং তাদের কাছ থেকে তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতো।

ডিসেম্বর মাসে সুকপিলাল কাছাড়ে গেলেন কয়েকজন (দুইজন চিকিৎসক) লোক সঙ্গে নিয়ে, অন্য চীফরা কেউই যায়নি। আলাপ প্রসঙ্গে সুকপিলাল জানিয়েছিলেন তার গ্রাম থেকে দক্ষিণে সাত দিনের পথ পর্যন্ত লুসাই রাজ্য বিস্তৃত এবং তাতে আছে দশজন চীফ্। সুকপিলাল নিজে একজন ক্ষমতাশালী চীফ্ বটে, কিন্তু তার চেয়েও ক্ষমতাবান চীফ্ রয়েছেন। যেমন সর্ব্ব দক্ষিণের গ্রামের বুতাই এবং বারমোঈলিন(Barmooeelin) যুদ্ধের জন তারা অনেক বেশী যোদ্ধা নামাতে পারেন। অন্যান্য চীফ্রা আসতে ভরসা পাচ্ছেন না, পাছে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের সেই লালছুক্লার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, পাছে আত্মসমর্পণের তেমনি তাদেরও দ্বিপান্তরিত করা হয় লালছুক্লার মত। ইংরেজ গভমেন্টের অধীন কুকিদের সাথে তাদের শত্রুতা আছে বটে, কিন্তু এক্ষণে তারা সকলেই ইংরেজ গভমেন্টের মিত্রতা কামনা করে। পূর্ব্ব বৎসর ইংরাজ সরকারের সৈন্য দলের চড়াও হওয়ার পূর্ব্বে তারা জানতো না যে কোন কুকি ইংরাজ গভর্ণমেন্টের রক্ষাধীনে বাস করছে।

সুকপিলাল তাঁর বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ একটি হাতির দাঁত নজর দিলে পর ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে কতগুলি কাপড় বকশিশ দেওয়া হয়েছিল। সুকপিলাল প্রতিশ্রুতি দেন যে, ফিরে গিয়ে খোঁজ করে দেখবেন কোন কোন বৃটিশ প্রজা তার এলাকায় আছেন কিনা। থাকলে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ১৮ই ডিসেম্বর সুকপিলাল স্বগ্রামে ফিরে যান।

এই সময় থেকে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত কাছাড় ও

শ্রীহট্ট কুকি উৎপাত থেকে মুক্তি ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চীফ্‌দের মধ্যে বিরোধের যেন বিরাম ছিল না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সুকপিলাল তার প্রতিনিধি মারফৎ ইংরাজ গভর্ণমেন্টের নিকট সাহায্যের আবেদন করে জানান যে, তার প্রতিবেশী চীফ্‌রা তাকে আক্রমণ করছে। মোল্লার চীফ্ বনপিলালও আবেদন করেন যে তিনি সুপারিনটেনডেন্টের অনুরোধ মত এবং আপন আন্তরিকতার প্রমানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বন্দী করে নিয়ে আসা থাদোদের চীফের ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সুপারিনটেডেন্ট যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর মোঙ্গলিন পিতৃব্য যিনি মণিপুরে বন্দী হয়েছেন তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। ইংরেজ গভর্ণমেন্ট এই সব আবেদনের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, অধিকারের বহির্ভূত এলাকার বাসিন্দাদের আত্ম কলহে হস্তক্ষেপের অভিপ্রায় গভর্ণমেন্টের নাই।

তখন ত্রিপুরার রাজবংশীয় কৃষ্ণচন্দ ঠাকুর ও মধুচন্দ ঠাকুর, দুই ভাই, ত্রিপুরার রাজার সাথে বিরোধ বশতঃ পালিয়ে গিয়ে বাস করছিল ফেনী নদীর তীরে। সম্ভবতঃ এদেরই প্ররোচনায় ঘটেছে এই আক্রমণ। কৈলাস সিংহের রাজমালা বলছে এই আক্রমণে অংশ নিয়েছিল রিয়াং সম্প্রাদায়ের লোকেরা, এবং রতন পুইয়ার লোকেরা। রিয়াংরা নাকি ঐ অঞ্চলের মহাজনদের থেকে কাচা টাকা ধার করতো। ঋণ পরিশোধের জন্য মহাজনরা ভীষণ চাপ দিচ্ছিল, তারি ফলে এই ঘটনা।

এই ঘটনার তদন্তের ভার পড়ে চট্টগ্রামের সুপারিনটেনডেন্টের উপর। তার পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ক্যাঃ রবনের নেতৃত্বে বিরাট একদল মিলিটারী পুলিশ যাত্রা করে রতন পুইয়ার গ্রামের উদ্দেশ্যে। সৈন্যদল দেখতে পেয়ে রতন পুইয়ার লোকেরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

এই অভিযান চলাকালেই ত্রিপুরার অভ্যন্তরে উদয়পুর থানার নিকটেই একটি আক্রমণ ঘটে। অল্প সংখ্যক বরকন্দাজ সংবাদ পেয়েই পালিয়েছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবার মোল্লার চীফ্ কাছাড়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট লোক পাঠিয়ে পশ্চিমের এক চীফ্ লাল পিতারির ও দক্ষিণ থেকে ক্রমাগত এগিয়ে আসা পোঈদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন জানান, কিন্তু সে আবেদন গৃহীত হয়নি।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আবার কুকি উৎপাত আরম্ভ হয় শ্রীহট্টে ও ত্রিপুরায়। জানুয়ারী মাসে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের নিকট খবর পৌঁছলো রামদুলাল বাড়ি, রামমোহন বাড়ি ও চন্দ্রাইপাড়া আক্রান্ত হয়েছে বলে গ্রামগুলো পাশাপাশি ও আদমপুর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই আক্রমণই প্রখ্যাত হয়েছে আদমপুরের হত্যাকান্ড নামে। এই আক্রমণ সম্বন্ধে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট প্রথম যে রিপোর্ট পেয়ে তাতে পূর্ব্বের মতই ত্রিপুরার রাজার প্রজাদের কাজ বলে দোষারোপ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছিল, প্রথম দু'টি গ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে। তৃতীয়টি (চন্দ্রাইপাড়া) ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে। অনুসন্ধানে এও প্রকাশ পেয়েছিল যে, এই সব আক্রমণ চালিয়েছিলেন চারজন চীফ্ (১) মুরছুইলাল (২) সুকপাইলাল, (৩) রাঙ্গবুঙ্গ ও (৪) লালহুলন। মুরছাইলালকে (মুরছুইলাল) ভুর সিলনও বলা হতো। সুকপিলাল বা সুকপাইলালকেও বলা হত ছপ্পুইলাল। মুরছুইলালের পিতা লালছুক্লাকে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে দ্বীপান্তরিত করা হয়েছিল। তাই মুরছাইলালের প্রতিজ্ঞা ছিল ইংরাজ গভর্ণমেন্টের উপর প্রতিশোধ নেবার। মুরাছাইলালের গ্রাম ছিল ধলেশ্বরীর নিকটের পাহাড়ে। তিনি বিয়ে করেছিলেন পরাক্রান্ত দলপতি মাপের কন্যা। সুকপাইলালের ভগ্নি পরমা সুন্দরী বানা থাঙ্গীকে, বান সই থাঙ্গী বা মণিপুরী ও কুকি ভাষা শিক্ষার সহজ উপায় পুস্তকে আছে, - "সুন্দরী বান্ থাঙীর বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষী কুকিরাজগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্মত্ত প্রায় হয়ে কত গ্রাম ভষ্মীভূত এবং কতশত নরনারী ও শিশুর মস্তক দেহ হইতে বিছিন্ন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।" এই বান থাঙীকে বিয়েতে যৌতুক প্রদানের জন্যই না কি কুকি চীফ্রা সম্মিলিত হয়ে আদমপুরের গ্রামগুলো লুঠ করে কয়েকজনকে বন্দী করে নিয়েছিল।

মুরছাইলাল ও রাঙ্গবুঙ্গ (রাঙবুঙ) ছিলেন ত্রিপুরার রাজার অধীন এবং সুকপাইলাল ছিলেন স্বাধীন লালহুলন মুরছাইলালের পিতৃব্য পুত্র।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ত্রিপুরার রাজাকে জানালেন যে, তাঁর রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোর উপর এ ধরনের হামলা আর বরদাস্ত করা যেতে পারে না। গভর্ণমেন্ট আশা করেছেন, তিনি অবিলম্বে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করে ভবিষ্যৎ আক্রমণের পথ রুদ্ধ করবেন। যদি এ বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তবে তাঁর প্রজাদের ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনিই দায়ী হবেন।

পাইতু চীফ্ মুরছাইলাল ক্রমাগত বাসস্থান পরিবর্তন করতেন কখনো চলে যেতেন ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরে, কখনো এসে বাস করতেন রাজ্যের অভ্যন্তরে। ত্রিপুরার মহারাজা তাঁকে এবং সুকপাইলালকে ধরে বিচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার তাতে স্বীকৃত হননি। কারণ সুকপাইলালের সাথে তখন তাদের কথাবার্ত্তা চলছিল সন্তোষজনকভাবে। এই সময় রাজার পক্ষ থেকে মুরছাইলালের উপর কোন আক্রমণে সুকপাইলালের সন্দেহ উদ্রিক্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করলেন। সম্ভবতঃ ত্রিপুরার রাজার অভিপ্রায়ের আঁচ পেয়েই অতঃপর মুরছাইলাল শ্রীহট্টে গিয়ে বাস করতে থাকে।

শ্রীহট্টের কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য পিটুনী অভিযানের প্রস্তাব করেছিলেন, গভর্ণমেন্ট সম্মতি তাতেও দেননি। কারণ কাছাড়ের সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ থেকে সুকপিলাল কাছাড়ের কর্তৃপক্ষের সাথে সৌহার্দ্দ রক্ষা করে আসছেন এবং প্রায়ই উপঢৌকন সহ লোক পাঠাচ্ছেন। লেঃ গভর্ণর কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারকে লিখেছিলেন যে, ফৌজ পাঠাবার আগে যেন সুকপিলালকে দিয়ে চেষ্টা করা হয় আটক বন্দীদের উদ্ধারের জন্য। আরও জানালেন যে, সুকপিলাল যদি তাঁর অধীন লোকদেরও অন্যান্য চীফ্দের লুটতারাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন, তা হলে তাঁকে

সোনাই (Sonai) ও টিপাই (Tipai) এর অন্যান্য চীফদেরও বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক। প্রতিদানে বশ্যতার নিদর্শনসরূপ ঐ সব চীফরা কিছু উপঢোকন দেবেন গভর্ণমেন্টকে।

সীমান্ত অঞ্চলের শান্তির জন্য ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট যে চেষ্টা করেছিলেন তার ফলে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন সুপারিনটেডেন্ট গ্রেহাম সাহেব ও রতন পুইয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। স্থির হয় যে, সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য গভর্ণমেন্ট প্রতি বছর রতন পুঙ্গয়াদের ৪০০ টাকা, হাঙলঙ্গদের ৮০০ টাকা এবং স্যাইলোদের ৮০০ টাকা করে দেবেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে পাহাড় অঞ্চলে ধান চালের বিশেষ অভাব দেখা দিয়েছিল। ডেপুটি কমিশনার ক্যাঃ ষ্টুয়াট এই সুযোগে ধান চাল দিয়ে সাহায্য করার সূত্রে আলাপ আলোচনা চালালেন। সেই খৃষ্টাব্দেরই অক্টোবর মাসে সুকপিলালের এক মন্ত্রী ও ভাই (Half Brother) গেলো ক্যাঃ ষ্টুয়ার্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে। আলোচনায় শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন যে আদমপুরের হত্যাকান্ডে তারা লিপ্ত ছিল বটে, কিন্তু তারা জানতো না যে, আক্রান্ত গ্রাম ইংরাজ সরকারের প্রজাদের। কিছু সংখ্যক বন্দী তারা বিক্রি করে দিয়েছে দক্ষিণের পোঈদের কাছে।

ক্যাঃ ষ্টুয়াট বলেছিলেন যে, যদি সুকপিলাল বন্দীদের সঙ্গে করে এসে দেখা করে এবং বন্ধুত্বে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তিনি ৫০ টাকা করে মাসোয়ারী পাবেন। শুধু বৎসরে একবার গভর্ণমেন্টকে তিনি নজর দিতে বাধ্য থাকবেন।

সুকপিলালের মন্ত্রী জানিয়েছিল সুকপিলাল অত্যন্ত অসুস্থ, চলতে ফিরতে সক্ষম নন, তাঁর আসা সম্ভব হবে না। তার পক্ষে তার উত্তরাধিকারী Lalongoor কাছাড়ে আসবেন।

এর কিছুকাল পরই ক্যাঃ ষ্টুয়াটের কাছে এসেছিল মুল্লার চীফ্ বনপিলালের লোক। সুকপিলালের সাথে যেরূপ ব্যবস্থার কথা

হয়েছিল, বনপিলালের সাথেও অনুরূপ ব্যবস্থার কথাই হয় ।

বনপিলালের দূত সোনাই নদীর তীরবর্ত্তী পাহাড়ের চা বাগানের ক্রম-বিস্তৃতিতে তাদের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন। ক্যাঃ ষ্টুয়াট তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে তাতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, বরং চা বাগানের সান্নিধ্যে পাহাড়ীদের সুবিধাই হবে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুকপিলাল বন্দী প্রের. দূরের কথা, বরং ডেপুটি কমিশনারকে জানিয়ে পাঠালেন যে, এক বৎসর পূর্ব্বে কাছাড়ের কুকি বসতিতে তাঁর Tribe এর তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। ফলে সুকপিলালের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে আয়োজন চলতে থাকে। কিন্তু বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। ঠিক ঐ সময়ই মণিপুরের দক্ষিণের অঞ্চলের লুসাই চীফ্ Vaguoil এর কাছ থেকে ডেপুটি কমিশনারের নিকট লোক আসে সাক্ষাতকারের জন্য।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে ক্যাঃ ষ্টুয়াট (capt stewarts) ব্যাপৃত ছিলেন সুকপিলালের এলাকায় খোঁজ খবর সংগ্রহের কাজে। সন্ধান নিয়ে তিনি জেনেছিলেন যে চট্টগ্রাম থেকে তার সাথে যোগাযোগ সম্ভব হবে না। আর কাছাড় থেকে সৈন্যদল পাঠাতেও অন্তত চারশত জনের নিতান্তই প্রয়োজন। এই কারণেই সৈন্যদল প্রেরণ স্থগিত রেখে আলাপ আলোচনাই চালানো স্থির হয়। এই উদ্দেশ্যে কাছাড় থেকে লোক পাঠানোর পূর্ব্বেই সুকপিলালের লোক গিয়ে উপস্থিত হয় কাছাড়ে। পূর্ব্ব শর্তানুযায়ী তারা বার্ষিক ভেট নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কোন বন্দী তাদের সঙ্গে ছিল না। capt stewarts বন্দী মুক্তি বিষয়ে জেদ করতে থাকেন এবং প্রত্যাবর্তনকারী লুসাইদের সাথে একজন দূতও পাঠিয়ে দেন। লুসাইরা চারটি ছেলেকে মুক্তি দিয়েছিল। জানিয়েছিল মুরছাইলাল নিষেধ করেছেন সুকপাইলালকে যে অপর বন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হয়। তা ছাড়া অনেক বন্দী সংসার পেতেছে লুসাইদের মধ্যে, তারা নিজেরাই প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক নয়।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আবার উপদ্রব শুরু হল মণিপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট

ও ত্রিপুরায়। নভেম্বর মাসে মণিপুরের এজেন্ট রিপোর্ট করেছিলেন যে, মণিপুর রাজ্যের নাগাদের কতগুলি গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে, আক্রমণকারী পূর্ব্বদিকের লুসাইরা। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে শ্রীহট্টের ম্যাজিস্ট্রেটও গভর্ণমেন্টকে জানালেন যে, আদমপুরের নিকটস্থ একটি গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে। এর কয়েকদিন পরেই শ্রীহট্টে খবর পৌঁছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকটি গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে এবং রাং রুং নামে এক চীফ্ পালিয়ে এসে শ্রীহট্টে আশ্রয় নিয়েছেন সুকপিলালের ভয়ে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, মুরছাইলাল বিয়ে করেছিলেন সুকপাইলালের ভগ্নী বান্থাঙীকে। কোন কারণে মুরছাইলাল বিয়ে করেছিলেন সুকপাইলালের ভগ্নী বান্থাকীকে। কোন কারণে মুরছাইলাল তাঁর স্ত্রী বান্নাঙীকে অপমান করেছিলেন। বান্থাঙী সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে তাঁর ভাই পরাক্রমশালী সুকপাইলাল বা দুম্পুইলালকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করেন। তাতেই ক্রুদ্ধ হয়ে সুকপাইলালকে এসে আক্রমণ করেন কৈলাসহর বিভাগের কুকি রাজাদের গ্রাম। ভীষণ উপদ্রবের পর সুকপাইলাল অনেক কুকি নরনারী বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন লুসাই পাহাড়ে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১২৬৮ ত্রিপুরাব্দের (১৮৬৮ খ্রীঃ) ১৪ই পৌষ রবিবার।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে লুসাইরা কাছাড়ে লোহার বন্দের চা বাগান জ্বালিয়ে দেয়। তারপর তারা মণিপু র দিকে এগিয়ে যায় । মণিপুরের এক উদ্বাস্তু কুমার কানাই সিংহকেও নাকি দেখা গিয়েছিল লুসাইদের সাথে। কাছাড়ের আক্রমণে দক্ষিণী লুসাই অর্থাৎ সুকপিলাল ও বনপিলালরাই সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে মনে করা হয়।

কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার অবিলম্বে পার্শ্ববর্ত্তী চা বাগানগুলোকে রক্ষার ব্যবস্থা করে আক্রমণকারীদের অনুসরণের আয়োজন করলেন, নির্দেশ দেওয়া হল। অপরাধীরা যদি বন্দীদের মুক্তি না দেয় তবে যেন তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়। চতুশ্চত্বা বিংশৎ ও সপ্তম নেটিভ ইনফেন্ট্রি এবং Eurasian batteary

of Artilary সৈন্যের দুইটি দল যাত্রা করবে। একটি ধলেশ্বরী নদী ধরে সুকপাইলালের গ্রামে অপরটি সোনাই নদী পথে বনপিলালের গ্রামে। ৭ম নেটিভ ইনফেন্ট্রির কিছু সৈন্য ও পুলিশ দল মিলে শ্রীহট্ট থেকে যাবে মিত্র পক্ষীয় রাং রুং এর গ্রামের দিকে এবং চেষ্টা করবে ধলেশ্বরী দিয়ে যাওয়া সৈন্যদলের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে। আরও ব্যবস্থা হয় যে মণিপুর রাজার একদল সৈন্য সহযোগিতা করবে এবং ত্রিপুরার রাজাও সাহায্য করবেন শ্রীহট্ট থেকে যাওয়া সৈন্য দলকে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, খবর পৌঁছলো কাছাড়ের যে আবার একটি লুসাই আক্রমণ হয়েছে মণিপুর রাজ্যে, তাতে বাঁধা পড়েছে মণিপুর থেকে সাহায্য পাঠানো ।

জেনারেল Nathall ধলেশ্বরী ধরে Pukwa Mukh, Beolung gang পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরই উপর্যুপরি সাতদিন বারিপাতের ফলে পথঘাট অগম্য হয়ে পড়ায় বাধা হয়ে ৭ই মার্চ তিনি প্রত্যাবর্ত্তন শুরু করেন।

শ্রীহট্ট থেকে যাত্রাকারী দলের পরিচালনায় মিঃ বেকার ও ম্যাজিস্ট্রেট Mr. Kemble দলটি ১৬ই মার্চ gootur নদী পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। সেখান থেকে opposite height এর সুকপাইলালের ও তার ভগ্নী বানথাঙীর গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। সৈন্যদল অগ্রসর হল, লুসাইরাও বাধা দিতে লাগলো। অবশেষে রসদের অভাবে পড়ে এবং জেনারেল Nathall এর সৈন্যদলের সাথে মিলিত হতে না পেরে এই দলও বাধ্য হল প্রত্যাবর্তন করতে।

পূর্ব্বভাগের দল ছিল মেজর Stephenson এর অধীনে, সঙ্গে ছিলেন কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার। এই দলকেও প্রবল বৃষ্টিপাতে বিশেষ দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছিল। তবুও তারা ১২ই মার্চ গিয়ে পৌঁছেছিলেন সোনাই নদীর বাজার ঘাট পর্যন্ত । সেখানে দেখা হল বলপিলালের ও তাঁর মাতা ইম্পনু প্রেরিত দূতদের সাথে। সঙ্গে নজর নিয়ে এসেছিল দূতেরা। তারা জানিয়েছিল যে, মাত্র কয়দিন হয় বনপিলাল মারা গিয়েছেন এবং বনপিলালের লোকেরা কেউ ঐ

সব আক্রমণে অংশ নেয়নি। শ্রীহট্টের সীমায় আক্রমণ করেছে সুকপাইলালের লোকেরা আর নোয়ারবন্দ (Nowarbond)ও মনিয়ার খাল আক্রমণের জন্য দায়ী Deota রাজা নামে অন্য এক চীফ্।

এ কথা শুনে বনপিলালের গ্রামে যাওয়ার সংকল্প পরিত্যক্ত হল । আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সময়টাও অনুকূল ছিল না। তবুও অভিযানটি আরও কিছু সফল করে তোলার জন্য আলোচনায় স্থির করা হল। লেঃ Broughসৈন্যদলের একাংশ নিয়ে যাবেন এক দিনের পথে পড়ে এমন গ্রামগুলিতে। সঙ্গে যাবেন ডেপুটি কমিশনার সাহেব । সেখানে গিয়ে সবচেয়ে নিকটের গ্রাম মোইজুলে (Moizul) পথে তাদের কয়েকবার বিক্ষুব্ধ অভিব্যক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইস্পানুর এবং বনপিলালের নাবালক ছেলের হয়ে প্রধানমন্ত্রী এসে বশ্যতা জানিয়ে যায়। প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যান, যে সব বন্দী ও আশ্রয় প্রার্থীদের প্রত্যার্পণের সবিশেষ চেষ্টায় ত্রুটি করা হবে না এই প্রতিশ্রুতির পর অভিযাত্রীদল প্রত্যাবর্তন করে।

অপরাধীদের শাস্তি প্রদান ও বন্দী মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত উক্ত অভিযানের ব্যর্থতায় লেঃ গভর্ণর ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট প্রস্তাব করেন। ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে শীতকালেই আবার লুসাই অঞ্চলে সৈন্যদল প্রেরণ করা সঙ্গত হবে Sirwgrey অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, লুসাইরা গভর্ণমেন্টের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচয় লাভ করে এবং নিজেদের ক্ষমতার দৌড় যে কতখানি তা সম্যক বুঝতে পারে। তিনি লুসাইদের গ্রামগুলি ধ্বংস করার চেয়ে সে অঞ্চলে বেশ কিছুকালের জন্য একদল সৈন্য রাখার পক্ষপাতী, যাতে লুসাইদের বিশ্বাস জন্মে যে, এই সৈন্যদল ইচ্ছে করলে যেখানে খুশি সেখানেই গিয়ে হানা দিতে পারে এবং লুসাইদের কল্যাণও নির্ভর করছে শান্তি প্রস্তাবে তাদের চীফদের সম্মত হওয়ার উপর।

লুসাই পাহাড় অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম। প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদির দরুণ বৎসরে অতি অল্প সময়ই এই অঞ্চলে অভিযান

চালানো সম্ভব। কাজেই নূতন করে অভিযান চালনো কর্তৃপক্ষ সঙ্গত মনে করলেন না। কোন অঞ্চলে আক্রমণ সংঘটিত হবার পর দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তনকারী পাহাড়ীদের পশ্চাৎ ধাবনও নিরর্থক বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। তৎপরিবর্ত্তে তাই বিশেষ সতর্কতার সাথে উপযুক্ত অফিসার নির্বাচন করে তার উপর প্রয়োজন মত অঞ্চলের ভার দেওয়া, তাঁর হাতে আকস্মিক আক্রমণ রোধের উপযুক্ত অস্ত্র ও সৈন্য দল রাখা, তাঁকে দিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধের কাজে গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করে তোলা, আলাপ আলোচনায় নাম মাত্র কর প্রদানে দুর্দ্দান্ত পাহাড়ী চীফদের রাজী করানো চেষ্টা করা এবং এদিকে ভ্রাম্যমান প্রহরী দল নিয়োগ ও ব্রিটিশ সীমান্তের ঘাঁটিগুলি দৃঢ় করে তোলার ব্যবস্থাই সঙ্গত বিবেচিত হল।

লর্ডমেয়ো (Lord Mayo) তখন ভাইসরয়। সৈন্যদল প্রেরণ না করে তিনি প্রস্তাব করলেন, গভর্ণমেন্টের আশ্রিত পাহাড়িয়াদের কাছাড় সীমান্তের বাহিরে বসতি করাতে এবং তাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে তাদের দ্বারাই শত্রুভাবাপন্ন অন্য পাহাড়িয়াদের উপদ্রব রোধের ব্যবস্থা করতে। ত্রিপুরা রাজ্যে একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্তির জন্যও বলা হল।

এই সময় লুসাই চীফদের প্রেরিত কয়েকজন বার্ত্তাবাহী কাছাড়ে আরো ডেপুটি কমিশনার মিঃ এডগারের সাথে আলাপ আলোচনায় মৈত্রী বাড়াতে। মিঃ এডগার প্রস্তাব করলেন, ঐ সব দূতদের সাথে স্বয়ং তিনি লুসাই পাহাড়ে যাবেন, এবং তাদের সহযোগিতায় চেষ্টা করবেন। কয়েকজন প্রধান চীফের সাথে সাক্ষাত করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ব্যবস্থা হয় মিঃ এডগারের সাথে আত্মরক্ষার জন্য ক্ষুদ্র একটি রক্ষিদল যাবে, আর যাবেন অফিসিয়েটিং সার্ভে সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ ম্যাক ডোল্যান্ড। তাঁর কাজ হবে কাছাড়ের দক্ষিণ সীমা নির্দ্ধারন করা এবং জ্ঞান অর্জ্জন করে আসা।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর মিঃ এডগার যাত্রা করলেন। দক্ষিণে তিনি গেলেন ব্যাপারী বাজার পর্যন্ত। স্থানটি সুকপিলালের গ্রামের নিকটে, সেখানেই তিনি সাক্ষাৎ করলেন সুকপিলাল ও তাঁর

পুত্রের সাথে। মিঃ এডগারের উপর নির্দেশ ছিল, তিনি যেন এমন কোন কাজ না করেন যাতে কোন উপজাতি দলের সাথে সংঘর্ষের ঝুঁকি তাকে নিতে হয়। তাই অতীতের কোন ঘটনার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবীর প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু তিনি গভর্ণমেন্টের কাম্য মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের কথা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন। তা শুনে সুকপিলালও সন্তোষই প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে আরও কয়েকজন চীফের সাথেও মিঃ এডগারের সাক্ষাত হয়েছিল। লুসাই চীফদের ও তাদের অধ্যুষিত অঞ্চলের অনেক সংবাদই এই সময় সংগৃহীতও হয়েছিল।

তাতেই প্রকাশ পেয়েছিল যে, যে সব অঞ্চল অনাধিগম্য বলে মনে করা বস্তুতঃ তাতে যাওয়া আসার বেশ প্রশস্ত পথ রয়েছে, তা দিয়েই সবাই আসে যায়। সে পথের অধিকাংশই অশ্বারোহনে গমনোপযোগী এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমা পর্যন্ত সে পথ বিস্তৃত।

তিন মাস পর মিঃ এডগার লুসাই অঞ্চল থেকে ফিরে আসেন। এসে তিনি যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তা আলোচনা করে গভর্ণমেন্ট নির্দ্দেশ দিলেন, আবার যেন তিনি ১৮৭০-৭১ খৃঃ শীতকালে ঐ অঞ্চলে যান। গিয়ে সুকপিলালের বা তাঁর লোকদের সাথে আলাপ করে স্থির করেন — মণিপুর থেকে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ব্রিটিশ অঞ্চলের সীমানা কতখানি।

মিঃ এডগার প্রস্তাব করেছিলেন যে চীফদের সনদ দেওয়া হবে। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে এই সনদ গ্রহণ করলে তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল নিরুপদ্রব থাকবে। তাঁরা লুসাই অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে toll আদায় করতে পারবেন। ব্রিটিশ এলাকাতে যে সব মেলা হবে তাতে পাহাড়িয়ারা অবাধে আসতে পারবে। ব্রিটিশ সীমানা ও লুসাই সীমানা বরাবর বসতি স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করা এবং মণিয়ার খাল থেকে বংকঙ্গ (Bongkong ) ও দ্বারবন্দ (Dwarband) রাস্তা থেকে রেঙ্গতু (Rengto) রেঞ্জ পর্যন্ত দু'টি পথ প্রশস্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। আর ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠাতে হবে একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট। তিনি এও মন্তব্য করেছিলেন যে, উপজাতি

পরিবারের লোকগুলির সাথে ভাল ব্যবহার করা হলে কাছাড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রশস্ত পথ করাতে কোন অসুবিধাই দেখা দেবে না।

মিঃ এডগারের উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন লাভ করেছিল। লুসাই অঞ্চলের জন্য অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন না করে সীমানা নির্দ্ধারনের জন্যই গভর্ণমেন্ট নির্দেশ পাঠালেন । তাতে একথাও উল্লেখ ছিল যে, গভর্ণমেন্টের অফিসাররা কাছাড় ও চট্টগ্রাম থেকে নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করবেন শুধু সাময়িকভাবে মৈত্রী মোলাকাতের জন্য।

অনুমোদিত প্রস্তাবগুলো কার্য্যে পরিণত করার আয়োজন চললো। মিঃ এডগার আবার গেলেন ব্যাপারী বাজারে। সেখানে গিয়ে সুকপিলালকে উপহার দিলেন এক প্রস্থ বিচিত্র পরিচ্ছদ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের Observer এ বেরুল —

"Sukpilal was invested with a dress of honour specially made for him-green pyjama with scarlet and gold flowers, a purple coat with green and gold embroidary, an undescribable hat of green and white silk, a Necklace of gold button and gold beads and two glass earrings"

ইংরেজ গভর্ণমেন্টের এই মৈত্রী প্রচেষ্টায় লুসাইরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি মৈত্রীর বাণী মুখে নিয়ে যারা এগিয়ে আসছে, তাদের হাতে তারা দাসত্বের শৃঙ্খলও দেখতে পেয়েছিল। তাই তারা মরিয়া হয়ে উঠল। মিঃ এডগার তাঁর কর্মস্থলে ফিরে যাবার পূর্ব্বেই (১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) খবর পেলেন যে, আবার উৎপাত শুরু হয়ে গিয়েছে।

ঐ সনের ২৩শে জানুয়ারী আক্রান্ত ও ভস্মীভূত হল কাছাড়ের হাইলাকান্দি সাবডিভিশনের আইনের খালের কাছাড়ী পুঞ্জী। তাতে

২৫ জন নিহত হলো, ৩৭ জন নীত হলো বন্দীরূপে। সেদিনই আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল আলেকজান্ডারপুর (Alexandarpore) চা বাগান ও চাকর মিঃ উইণ চেষ্টার নিহত হলেন। আক্রমণকারীর ঘরে নিয়ে গেলো তাঁর বালিকা কন্যা মেরি উইণ চেষ্টারকে। এর কয়েক ঘন্টা পরেই আক্রান্ত হয়েছিল পার্শ্ববর্ত্তী কাঙলিছেলা বাগানটি। বাগানের ভারপ্রাপ্ত Messrs, Bagshawe and cooke প্রবল বাধা দিলেন সাহস করে। তখন তার একদল আক্রমণকারীও চড়াও হয়েছিল বাগানের কুলি বস্তিতে। মিঃ কুক সে আক্রমণও প্রতিরোধ করেছিলেন কয়েক জন কুলি নিয়ে। আক্রমণকারীরা চলে যাবার পর ফলবিক্রেতা দু'জন কাবুলিওয়ালা এবং আরও কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন আলেকজান্ডারপুর চা বাগানে। সেখান থেকে মিঃ উইন চেষ্টারের মৃতদেহ উদ্ধার করেন, এবং কয়েকজন আহত কুলিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন শুশ্রূষার জন্য।

২৪শে জানুয়ারী আবার ৩৫ জন লুসাই আক্রমণ করে কাঙলিছড়া চা বাগান। তাদের ১৫ জনের হাতেই বন্দুক ছিল। কিন্তু তারা সুবিধা করতে পারেনি। পূর্ব্ব রাতেই কয়েকজন পুলিশ এসে পৌঁছেছিল। তাদের এবং ক'জন ভৃত্যের সহযোগিতায় গুলি চালিয়ে Messrs Bagshowe আহত করলেন দু'জন আক্রমণকারীকে, বাকী সকলে পালিয়ে গিয়েছিল সেই আহতদের ফেলেই।

২৭শে জানুয়ারী রাত্রে একদল লুসাই চড়াও হল গিয়ে মণিয়ার খাল বাগানে, সেখানে কিছু সংখ্যক সিপাহী ও পুলিশ প্রহরী ছিল। আকস্মিক আক্রমণে তাদের মধ্যে একজন হল গুলিবিদ্ধ, অপর একজন হল দা দ্বারা আহত। ষ্টকেডের কমান্ডে যে হেড কনষ্টাবুল ছিল, সে গুলি বর্ষণ করল যথাসাধ্য, নিজেও আহত হল শত্রুর গুলিতে। এরপর ষ্টকেডের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। তখন একদল গিয়ে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালায় কুকি বস্তিতে। পরদিন সমস্তাটা দিনই প্রায় এই কাজ চলছিল। তারপর দিন ডিষ্ট্রিক পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ ডেলি সেখানে এসে উপস্থিত হন কিছু সংখ্যক সিপাহী ও পুলিশ নিয়ে। কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রেই চলে গিয়েছিল আক্রমণকারীরা। পরে প্রকাশ

পেয়েছিল যে, এই সংঘর্ষের ফলে আক্রমণকারীদের ৫৭ জনকে হারাতে হয়েছে।

এরপর লুসাইরা কাছাড়ের বিভিন্ন গ্রাম আক্রমণ করল। তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কলিকাতা থেকে কাছাড় দলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য সংগৃহীত প্রায় আটশত কুলী পাঠিয়ে দেওয়া হল ১৪ই নভেম্বর ১৮৭১ খৃঃ তারিখে। গোয়ালনন্দ ছাড়তেই তাদের মধ্যে কলেরা দেখা দেয়। ঢাকায় মেডিক্যাল এডভাইস নেয়া হয় - এই অবস্থায় আর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত কিনা অনুকূল অভিমত পেয়ে যাত্রা অব্যাহতই রাখা হয়। কিন্তু ঢাকা থেকে ছাতকের মধ্যে ঐরোগ মহামারী আকার ধারণ করে। ছাতকে পৌঁছলে দেখা গিয়েছিল যে, কুলীর সংখ্যা ৬০১ এসে ঠেকেছে।

চিটাগাঙ্গ দলের সঙ্গে যাবার জন্যও ৩১৬ জন নেপালী কুলী সংগৃহীত হয়েছিল। তাদের মধ্যেও কলেরা দেখা দিয়েছিল চিটাগাঙ্গ যাবার পথে এবং তাতে মারা পড়েছিল ৪০ জন।

অন্যান্য জাতির লোকও কুলীর কাজের জন্য সংগৃহীত হয়েছিল ৪৬১৮ জন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে। তাদের মধ্য থেকে ৪,৪০৩ জনকে কাছাড় (১৯২৪) ও চট্টগ্রামের (২৪৭০) জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন জাতির লোক নিয়ে বাম কলামের কুলীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৭৬৪ জন, আর ডান কলামের হয়েছিল ২৭৯১ জন।

কাছাড় সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল এক কোম্পানীর সেপার্শ (Sappers) ২২নং পাঞ্জাব নেটিভ ইনফেনট্রির ৫০০ লোক এবং ৪৪নং আসাম লাইট ইনপেনট্রিসহ অর্দ্ধ বেটারী (Battery) গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে। কুলীদের সঙ্গে ছিল ১৭৮টি হাতি। টিপাই ও বরাক নদীর সঙ্গম স্থল বা টিপাই মুখ নামে পরিচিত - নির্দ্ধারিত হলো সেখান থেকেই যাত্রা শুরু হবে। ১৫ই ডিসেম্বর অধিকাংশ সৈন্য সেখানে সমবেত হল। তারপর সেখান থেকেই তারা অগ্রসর হতে থাকলো দুর্গম পথ অতিক্রম করে। ২রা, ফেব্রুয়ারী তারা গিয়ে পৌঁছল চীফ Poiboiর সুরক্ষিত গ্রাম Sellam এ। সেখানে

পৌঁছার পূর্ব্বে Moorthiong range এর সংঘর্ষ ঘটে। অগ্রগামী সৈন্যদলের উপর গুলী বর্ষিত হলে প্রত্যুত্তরে সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে গুলী বর্ষণ চলতে থাকে। প্রতিপক্ষ মোটামুটি শক্তিশালীই ছিল। ৪৪নং আসাম লাইট ইনফেনট্রি তাদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়ে তাদের পর্য্যুদস্ত করে এবং উঁচু এক পাহাড়ের উপর পর্যন্ত অনুসরণ করে গিয়ে দু'টি ঘাঁটি দখল করে। এই সংঘর্ষে নিহত শত্রুদের নিকট ইংলিশ আর্ম মিউশন পাওয়া গিয়েছিল, তাতে প্রমাণিত হয়েছিল যে পূর্ব্ব বৎসর মণিয়ার খাল ইত্যাদিতে এরাই আক্রমণ চালিয়েছিল।

১২ই ফেব্রুয়ারী কাছাড় কলামের এক ক্ষুদ্র অংশ, কেবল অত্যাবশ্যক পরিমাণ রসদ নিয়ে sellam থেকে লালবুড়া (Lalboorah)র গ্রামের দিকে যাত্রা করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ খৃঃ তারা চম্পাইয়ে প্রবেশ করে, সেটাই লালবুড়ার গ্রাম। কিন্তু সে গ্রাম তখন পরিত্যক্ত হয়েছে। গ্রামের মধ্যে ছিল বনোলেলের (Vonolel) সমাধি উঁচু একটি ভিত বা বেদীর মত স্থান। চারিদিকে নানা জাতীয় প্রাণীর মাথার খুলি ঝুলানো মধ্যস্থলে একটি বংশখন্ড পোঁতা তাতে এক সদ্য নিহতের মস্তক ও হস্ত পদাদি বাঁধা গ্রামটিতে ঘর ছিল পাঁচ শতাধিক, সেগুলি সবই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

বনপিলালের পোইবোই ও বনোলেলের অধীন উপজাতীয়রা বাধ্য হলো বশ্যতা স্বীকার করতে বনোলেলের সদর ঘাটিটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করা হয়েছিল। জেনারেল সাহেব গেলেন বনোলেলের বিধবা পত্নীর গ্রামে। গিয়ে জানালেন, সেই গ্রামটি এবং লালবুড়ার অন্যান্য গ্রামগুলির কোন ক্ষতি করা হবে না। এই শর্তে যে —

১। গভর্ণমেন্টের এজেন্ট লালবুড়ার গ্রামে যেতে এবং তার অঞ্চল দিয়ে মালপত্র আনা নেয়া করতে পারবে বিনা বাধায়।

২। তিন জন জামিন স্বরূপ এই সৈন্যদলের সাথে যাবে টিপাই মুখ পর্যন্ত।

৩। মণিয়ার খাল প্রভৃতি থেকে যত সংখ্যক বন্দুকাদি অপহরণ

করা হয়েছে, সব ফিরিয়ে দেবে বা ঐ সংখ্যক অস্ত্র ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এনে দেবে।

৪। দুটো হাতীর দাঁত, এক সেট যুদ্ধের গং বাদ্য, একটি নেকলেস, ১০টি ছাগ, ১০টি শূকর, ৫০টি মোরগ, ২০ মন চাল, এনে দেবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে।

লুসাই দলপতিরা বাধ্য হয়েছিল প্রস্তাবিত শর্ত মেনে নিতে। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সৈনদলকে কোন সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তারা ফিরে এসে পৌঁছে টেপাই মুখে।

দক্ষিণ বা চিটাগাঙ্গ কলাম ও কাছাড় থেকে যাত্রাকারী সৈন্যদলের মতই শক্তিশালী ছিল এবং এই দল গঠিত হয়েছিল প্রধানতঃ গুর্খা রেজিমেন্টের সৈন্যদের নিয়েই। এই দলের সম্মুখ ঘাটি বা শিবির স্থাপিত হয়েছিল কর্ণফুলীর তীরে, ডেমাগিরীতে নভেম্বর মাসের শেষভাগে সেখানে অভিযানকারীরা সমবেত হয়েছিল। এই দলের অধিনায়ক জেনারেল ব্রাউনলোর উপর নির্দেশ ছিল, স্যাইলো ও হাউলঙ্গদের বশ্যতা স্বীকার করাতে হবে হাউলঙ্গেরাই অপেক্ষাকৃত দূরের বাসিন্দা। আলেকজান্ডারপুর চা বাগান লুঠ করে এরাই সেখান থেকে মেরি উইন চেষ্টারকে ধরে নিয়ে এসেছিল।

চীফ রতনপুইয়া এলেন বরখাল (Burkhal)। তিনি অভিযাত্রী বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন কিনা সে বিষয়ে ইংরেজদের মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন এবং অভিযাত্রী বাহিনীকে পথ দেখিয়ে স্থল পথে ডেমাগিরীতে নিয়ে এসেছিলেন বরখাল থেকে। এরপরও অভিযানকালে যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলেন কথা চালা চালির ব্যাপারে।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে সৈন্যদল স্যাইলোদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। উপর পূর্ব্বদিক স্যাইলো সভোঙ্গা অঞ্চল দখল করে। সেখান থেকে সভোঙ্গার এক পুত্র লালজিকার গ্রামে প্রবেশ করে। ঐ পর্যন্ত যাবার পর সৈন্যদলকে অগ্রসর হতে হয় দুর্গম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। স্থানে স্থানে জঙ্গল কেটে তাদের পথ করে

নিতে হয়েছিল। যাবার পথে তারা ভীষণ আঘাত হেনেছিল শত্রু পক্ষের উ পর । Vanhnoya, vanshumah, Vanunah, vanhoolen এর সুরক্ষিত গ্রামগুলি অধিকার করেছিল এবং সেই সব গ্রামে সঞ্চিত ধানের গোলা সব পুড়িয়ে দিয়েছিল।

লালজিকা থেকে সৈন্যদলকে নিয়ে যাওয়া হল Savoongaর দিকে। উদ্দেশ্য সেখান থেকে অভিযান চালানো হবে উত্তরে Bowlong দের অঞ্চলের।

রতনপুইয়া ও পুলিশের সুবাদার মহম্মদ আজিমকে পাঠানো হল হাউলঙ্গদের ওখানে। আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো বা না চালানো নির্ভর করে রইলো তাঁরা কি বার্তা নিয়ে ফিরে আসেন তারই উপর।

ইত্যবসরে ক্যাঃ লেউইন দু'জন দূত পাঠালেন Benkuia-র নিকট। এই হাউলঙ্গ চীফ্ Benkuia-র নিকটই ছিল মেরি উইন চেষ্টার। Benkuia তৎক্ষণাৎ শুধু মেরি উইন চেষ্টারকে প্রত্যার্পণ করলেন, অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দান ও তাঁর নিজের বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্ন অমীমাংসিতই রয়ে গেল। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দূতেরা সাক্ষাত পেল রতনপুইয়া ও পুলিশ সুবেদারের। সুবেদার সাহেব মেরি উইন চেষ্টারের ভার নিয়ে তাকে নিয়ে গেলেন ডেমাগিরির নিকটস্থ রতনপুইয়া গ্রামে। সেখান থাকে তাকে পাঠানো হল চট্টগ্রামে। রতনপুইয়া গেলেন দক্ষিণের হাউলঙ চীফ বন্দুলা (Vandoola)র কাছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী জেনারেল ব্রাউনলো সৈন্যদলের একাংশ নিয়ে যাত্রা করলেন উত্তরে হাউলঙদের অভিমুখে। সৈন্যদল ধলেশ্বরী অতিক্রম করে পরদিন সাক্ষাত পেল কিছু সংখ্যক বিপক্ষীয় লোকদের সে সব পাহাড়িয়ারা আসছিল রতনপুইয়ার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বশ্যতা স্বীকারের জন্য।

সৈন্যদলের যাত্রা অব্যাহতই ছিল, যতক্ষণ না সঠিক সংবাদ এসে পৌঁছেছিল যে, Senkuio সভোঙ্গা এগিয়ে আসছেন বশ্যতা

স্বীকার করতে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারা এসে পৌঁছলো এবং বিনা আপত্তিতে সকল শর্ত মেনে নিল। এরপর দু'দিনের মধ্যেই এসে অনুরূপ শর্তস্বীকার করে নিল লালবুরা, জাতোমা ও লিয়েনারকোরী প্রভৃতি উত্তরের হাউলঙ চীফ্‌রা।

২৩শে তারিখে সৈন্যদল Syloo Savoonga -র প্রত্যাবর্ত্তনের পথ ধরেছিল। সেখানে লালনুরা (Lalgnoora), লালজিকা (Laljecka ), বন্নুয়া (Vanhnoyah), বনলোয়া (Vanlooa) ও অপর তিন জন চীফ সমগ্র স্যাইলোদের হয়ে এসে বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং হাউলঙদের অনুরূপ শর্ত মেনে নিয়েছিল ।

বাকী দক্ষিণী হাউলঙদের দমনের জন্য সৈন্যদল পুনারায় ফিরে এলো ডিমাগিরীতে। সেখানে থেকে আবার যাত্রা করলো রতনপুইয়ার গ্রামের পূর্ব্বদিকে। তিন থেকে পাঁচ দিনের পথ বলে কথিত Sypoea Vadoola-র গ্রামের দিকে। সাইপুইয়া গ্রাম প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী। সাইপুইয়া অবিলম্বে এসে বশ্যতা স্বীকার করলো। ১২ই তারিখে Vantonga এলো একদল বন্দী নিয়ে। পরদিন সকালে এলো বন্দোলার জ্যেষ্ঠপুত্র Sanglieoa -তার পিতার পক্ষে সে বশ্যতা স্বীকার করলো । সে রাজী হয়েছিল বন্দীদের ছেড়ে দিতে ।

এইভাবে দুর্ধর্ষ পাহাড়ী চীফদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারী সৈন্যদলের সবাই ফিরে গেল চিটাগাঙে। এই সৈন্যদল চিটাগাঙ থেকে ২৩১ মাইল এবং পূর্ব্ববর্তী ঘাটি থেকে ৮০ মাইল পর্যন্ত হাউলঙ অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল।

নিম্নলিখিত চীফেরা বশ্যতা স্বীকার করে জেনারেল ব্রাউনলের অর্পিত শর্ত গ্রহণ করেছিল।

সুরইলো - সভোঙ্গা তৎপক্ষে পুত্রেরা

লালজুরা (Lalgoora)

লালজিকা (Laljecka) সভোঙ্গার পুত্র

বন্মুয় (Vanhuoya) রতনপুইয়ার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

বনকুঙ (Vankung)

বননুয়া (Vanhnua)

বনহুলেন (Vanhoolen)

দওলিয়েভ (Dowlyeva) সভোঙ্গার অধীন

বনলুলা (Vanlula)

বনসুমা (Vanshuma)

লাললেরা (Lalhlura)

হাউলঙ্গ (উত্তরী)

সঙ্গবুঙ্গা (Sanbunga) এরা দুই ভাই প্রথম জন

বেনকুইয়া (Benkuia) রতনপুইয়ার বোনকে বিবাহ করেছিলেন।

বনসাঙ্গ (Vansanga)

ছোঙ্গমামা (Chongmama) সঙ্গবুঙ্গর অধীন

লিয়েন - যুকোম (Lien-v-koom)

লালবুরা (Lalbura) দুই ভাই স্বাধীন

জো-তেমা(Jo-ht-oma)

হাউলঙ (দক্ষিণী)

বন্দোলা (Vandoola) তৎপক্ষে তৎপুত্র সঙ্গহেনা।

বনতোঙ্গা ও তার দুই ভাই বন্দোলার আত্মীয়।

সঙ্গহেনা (Sanghena) বন্দোলার বড় ছেলে।

সইপুইয়া (Saipoiya) রতনপুইয়ার ভগ্নীপতি বন্দোলার ভ্রাতা।

অভিযানকারী উভয় সৈন্যদলের সাথেই জরিপ কাজের জন্যও লোক নেয়া হয়েছিল। তারা ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে ৬৫০০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখন্ডের Topographical শেষ করে নেয় তাতে কাছাড় ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী জরিপের বাকী অংশের জরিপ সমাধা হয়।

দক্ষিণের জরিপকারী দল ছিল মেজর জেনারেল ম্যাকডোনাল্ডের (Macdonald) অধীনে। তারা উত্তরদিকে এগিয়ে ২৩০০ বর্গমাইল এলাকার triangulation এবং ১৭০০ স্কোয়ার মাইল এলাকার Topographical Mapping শেষ করেছিল।

উত্তরের দলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন Captain Bodgley । তিনি কাছাড় শেষ করিয়েছিলেন প্রায় ৬০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের Triangulation এবং ৪৮০০ বর্গমাইল এলাকার Topography ।

দক্ষিণে রজরিপকারীরা জরিপ করেছিল ২২°৩০´ ও ২৩°৫৫´ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৯২°৩০´ ও ৯০ পূর্ব্ব দাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত ভুখন্ড। আর উত্তরের দল জরিপ করেছিল ৯০°৩০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এবং প্রায় ২৩০ উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল।

জরিপকারী উভয় দল কোথাও পরস্পর মিলিত হতে পারেনি, তাই কিছু স্থান জরিপের বাকী থেকে গিয়েছিল। লুসাই চীফদের সম্বন্ধে অতঃপর কি নীতি গৃহীত হবে সে প্রশ্ন স্থগিত রেখে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট তখনকার মত সমগ্র দক্ষিণ কাছাড় ও শ্রীহট্ট সীমান্তে শক্ত ঘাটি স্থাপনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন। এই অভিযানের পর লুসাইরাও আর তেমন বিপজ্জনক কোন উপদ্রব সৃষ্টি করেনি।

১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন চীফ্ গিয়ে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন, কোন কোন চীফ্ তাঁদের মন্ত্রী বা এজেন্টকে পাঠালেন কিছু উপঢৌকনসহ। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে অনেক লুসাই নেমে এসেছিল উত্তর কাছাড়ে গো-মহিষ ক্রয় করতে। সে অর্থ তারা সংগ্রহ করেছিল রাবার

বিক্রয় করে। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে শীতকালে আবার অনেক লুসাই এসেছিল বরাক নদীর উভয় তীরে রাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। প্রহরীরা তাদের নিষেধ করেছিল। তারাও কোন প্রতিবাদ না করেই চলে গিয়েছিল সেখান থেকে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সুকপিলালের এজেন্ট গিয়ে জানালো যে, তাদের এলাকায় চালের ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছে। গভর্ণমেন্ট থেকে এই আবেদন অনুসারে সে অঞ্চলে চাল প্রেরিত হয়েছিল এবং ব্যবসায়ীদের প্রবৃত্ত করা হয়েছিল অধিক পরিমাণে চাল পাঠাতে। তখন লুসাই এলাকায় বাজার ছিল তিনটি - চাঙ্গশিল (পূর্ব্ব নাম ব্যাপারী বাজার), সোনাই বাজার ও টিপাই মুখ বাজার। বাজারগুলো ক্রমে বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চীফরা ব্যবসায়ীদের উপর কর ধার্য্য করে বসেছিলেন। এবং পরে পাহাড়ীদের কাছ থেকে রাবার প্রাপ্তির অভাব ঘটায় বাজারগুলির অবনতি ঘটতে থাকে।

১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট লক্ষ্য করলেন যে, লুসাইরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে ব্রিটিশ এলাকার দক্ষিণ দিকে। লুসাইদের এই উত্তর দিকে এগিয়ে আসার কারণ সম্ভবতঃ দক্ষিণের ও পূর্ব্বদিকের উপজাতিদের ক্রমাগত চাপ। এই এগিয়ে আসা বন্ধ না হলে হয়তো এরই মধ্য থেকে যাবে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ। এই ভেবে চীফ্ কমিশনার নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন - এলাকার বহির্ভূত অঞ্চলের উপজাতিরা এসে এলাকার অভ্যন্তরে বসবাস করতে পারবে না এবং তা করতে হলে পূর্ব্বাহ্নে অনুমতি নিয়ে তাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলেই বাস করতে বাধ্য থাকবে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার Mr. Luttman Johnson, এসি কমিশনার রায় বাহাদুর হরিচরণ শর্ম্মা এবং এসি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট Mr. Savi ৫০ জন ফ্রন্টিয়ার পুলিশ নিয়ে লুসাই অঞ্চলের ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থিত চাংশিল (Changsil ) বাজারে যান। সেখান থেকে এই দল পাহাড়ী পথে সোনাই বাজারে গিয়ে উপনীত হন। তারপর এগিয়ে যায় বরাক নদীর তীরে Kuli Charramukh এ। সেখানে

গিয়ে তারা নৌকায় আরোহন কররে এবং মনিয়ার খাল Monier Khal আউট পোষ্টের পথে শিলচরে ফিরে যান। Mr Johnson প্রায় তিন সপ্তাহ লুসাই পাহাড়ে কাটিয়েছিলেন এবং সেখানে যাদের সাথে তিনি মিলিত হতে পেরেছিলেন তাদের দ্বারাই বিশেষ সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন কিন্ত তিনি সুকপিলালের বা তার পুত্র Khalgon এর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ঐ চীফের বিভিন্ন কারণে সাক্ষাৎকারে অসমর্থ বলে খবর পাঠিয়েছিল। তবু ডেপুটি কমিশনার গিয়ে সুকপিলালের প্রিয় পুত্র বলে কথিত Sailengpoi এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন ও সাক্ষাৎকার সময়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যাবহারই করেছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টব্দের মার্চ মাসে ইংরেজ সরকারের নিকট এক অবাঞ্চনীয় খবর পৌঁছালো ত্রিপুরার রাজার তিনটি ঘাঁটি ছিল রাজ্যের উত্তরে শ্রীহট্ট সীমান্ত বরাবর। সেই ঘাঁটিগুলি তারই রাজ্যে কমলপুর, কৈলাশহরে ও ফারুয়া ধর্মনগরে। সেখান থেকে গোমতীর শাখা একছড়া পর্য্যন্ত (পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা একদিনের পথ দূরবর্তী) স্থানের মধ্যে কোন চৌকী স্থাপিত হয়নি। আবার সেখান থেকে দু'দিনের পথ দূরে, গোমতীর তীরে উদয়পুরে ছিল আর একটি ঘাঁটি। দক্ষিণ দিকে নোয়াখালীর ধারে ঋষ্যমুখে ছিল আর একটি।

১৮৭৮ থেকে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের পূর্বে ইংরেজ ও লুসাইদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটার মতো উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। ঐ সময় একদল লুসাই সুকপিলালের রক্ষণাধীনে চাঙ্গশীল (Changsil) বাজার লুঠ করে। লুঠেরাদের চেনা যায়নি। ব্যবসায়ীরা সুকপিলালের মন্ত্রী ও প্রতিবেশী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে, পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে গভর্ণমেন্টের নিকট নালিশ জানাল। দুষ্কার্য্যের দায় চাপাতে চাইল পূর্ব্বদিককার পাহাড়ীদের উপর। কিন্তু অনুসন্ধানে অবিশ্বাস্য বিবেচিত হওয়ায় গভর্ণমেন্ট সুকপিলালের উপরও দোষ চাপালেন। বলে পাঠালেন যে, সুকপিলাল ব্যবসায়ীদের ক্ষতির এক চতুর্থাংশ প্রদান না করেন ততকাল কোন ব্যবসায়ীকে উক্ত বাজারে যেতে দেয়া হবে না। ঐ সময় Poiboi এর গ্রামে Sennony

থেকে ছয় জন লুসাই এসে লালহাই (Lalhai)-র বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা আরো জানায় যে, Poiboi শীঘ্রই, এই ধান কাটা হয়ে গেলেই, তাঁর মন্ত্রীদের পাঠাবেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পুইবুই ও খলগমকে তাদের বাজারগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

৬ই ডিসেম্বর একদল লুসাই রাবার সংগ্রহকারী কিছু সংখ্যক নেপালীদের উপর চড়াও হয়ে যা পায় কেড়ে নেয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান নেওয়া হয়, কিন্তু অপরাধীদের পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যায়।

৮ই ডিসেম্বর Khalgom - র কয়েকজন মন্ত্রী ও আরো কয়েকজন লোক পূর্ব্বদিকের লুসাইদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা জানাতে যায়। গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে তাদের বলা হয় যে, শীঘ্রই পুইবুই ও লেঙ্গকোমতর মন্ত্রীদের উপস্থিতি আশা করা যাচ্ছে। যদি তারা সুকপিলালের মন্ত্রীদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে শান্তির প্রতিশ্রুতির চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

ডেপুটি কমিশনারের এক বাঙ্গালী বার্তাবাহককে পাঠান হয়েছিল গৃহে সুকপিলালের মন্ত্রীদের সাথে। ১৫ই জানুয়ারী ফিরে এসে তিনি জানালেন যে, চাঙ্গশিল বাজারে ডাকাতির বিষয়ে সুকপিলাল বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন। কিন্তু প্রকৃত অপরাধী কারা তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তিনি কোন ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত নন। তবে পক্ষকাল মধ্যেই এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁর মন্ত্রীদের পাঠাবেন। প্রতিশ্রুতি মত মন্ত্রীরা ফেব্রুয়ারী মাসে পাহাড় থেকে নেমে এল। অনেক আলোচনার পর তারা স্বীকৃত হন যে, সুকপিলাল ১০০০ টাকা জরিমানা দেবেন এবং ঐ পরিমাণ অর্থ দেবেন পুনঃ চাঙ্গশিল বাজার খোলার জন্য। এই সময় পূর্ব্বদিকের চীফদের মন্ত্রীরাও এসে উপস্থিত হন। তারা যা জানিয়েছিলেন তাতে একথাই প্রকাশ পেয়েছিল যে, উপজাতিয়দের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যকার এই পরস্পর শত্রুতা কেউ আর পছন্দ করছে না। তবু যে তাহা ঘটছে, সে শুধু চীফদের পরস্পরের প্রতি প্রবল ঈর্ষার ফলে।

মন্ত্রীদের বক্তব্য থেকে এমন মনোভাবের আভাষও পাওয়া গেল যে, সন্ধি স্থাপিত হলে সবাই আনন্দিত হবে, কিন্তু আলোচনা অগ্রগামী হওয়ার লজ্জা প্রত্যেক দলকে পিছিয়ে রাখছে।

ডেপুটি কমিশনার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য উভয় পক্ষের সম অগ্রগামীতাই শোভন ও সঙ্গত হবে, এবং ঘোষণা করবে যে ডেপুটি কমিশনারের উপদেশ মতোই তারা একাজ করতে এসেছে। এরপর ৮ই মার্চ তারিখে মন্ত্রীরা সবাই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সুকপিলাল প্রথমে 'ঘর চুক্তি খাজনা' বসিয়ে জরিমানার টাকা উঠাতে চাইলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। সবাই ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললো যে, বাজার থেকে যে লাভ হয়েছে তা চীফদেরই হয়েছে। কাজেই গভর্ণমেন্টের দাবীকৃত অর্থের ব্যবস্থা করা চীফদেরই কর্তব্য। প্রজা সাধারণের তাতে কোন দায় নেই। এরপর সুকপিলাল তার করদ চীফ সাইলেঙ্গপুই (Sailengpui), লেংপুঙ্গা (Lengpunga), লেংকুঙ্গা (Lenkunga) ও বানিয়াতুঙ্গি (Baniyatungi)র কাছ থেকে ১০০ টাকা করে সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁর ছেলে খলগোম (Khalgam) দেন ৬০ টাকা এবং সুকপিলাল নিজে দিলেন ১০০ টাকা। এক্ষণে ৫৬০ টাকা গভর্ণমেন্টের দাবী আদায়ের জন্য প্রেরিত অফিসারের নিকট জমা দিয়ে বলা হয় যে, বাকী ৪৪০ টাকা মাসখানেকের মধ্যেই আদায় করা হবে। উক্ত অফিসার বাকী টাকা আদায়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারেননি তার রসদপত্র নিঃশেষিত হওয়ায় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাছাড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হন। চীফ কমিশনার বাকী টাকার দায় থেকে সুকপিলালকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল গভর্ণমেন্টের নিকট খবর পৌঁছে যে, সুকপিলালের tribe এরই একদল লোক সুকপিলালের পুত্র Lalbruma ও Langpung যাত্রা করেছে Poiboi ও Lengkam এর এবং অন্য করদ চীফ Chungle এর গ্রাম আক্রমণ করতে। Lengkom নাকি কয়েকটি জুমের টংঘর জ্বালিয়ে

দিয়েছিল। এ অভিযান তারই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। কিন্তু সংঘর্ষ ঘটাতে পারেনি, পুইবুইয়ের পিতামহী এক রাণী আলাপ আলোচনার দ্বারা উভয় পক্ষকে শান্তি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সোনাই বাজার থেকে চীফ কমিশনারের নিকট খবর পৌঁছে যে Sailegpui ও অন্যান্য চীফেরা যাত্রা করছে Poiboi, Lengkam ও Chungleng নামক চীফদের উপর আক্রমণ পুনরারম্ভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কাছাড় থেকে টিপাই সৈন্যদল প্রেরীত হয়েছে বলে শুনতে পেয়ে তারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পরের মাস লুসাইরা টিপাইমুখ বাজারের ১৪ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনের গ্রাম Senong Punji থেকে একটি হাতীর দাঁত নিয়ে গিয়ে ডেপুটি কমিশনারের সাথে সাক্ষাত করে এবং জানায় যে, তাদের গ্রামের লোকেরা খাদ্যাভাবে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। চীফ কমিশনারের সম্মতি নিয়ে ৩৫ মন ধান্য ক্রয় করে তাদের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পূর্ব্বদিকের লুসাইরা তাদের পূর্বদিকের কুকিদের দ্বারাও সন্ত্রাসিত হচ্ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাত্র মণিপুর রাজ্যের অধীন পইতে (Paite)রা আক্রমণ করে (Lalbura) লালবুরার ভ্রাতা Sontongeর গ্রাম। এই আক্রমণে একজন লোক নিহত হয়। লুসাইরা প্রতিশোধাত্মক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি, কারণ ঐ সময় তারা আর এক সমস্যার সম্মুখীন ছিল। সোকতে (Soktea)বা দাবী করছিল করের জন্য। এই দাবী রোধের জন্য সংঘ শক্তি নিয়োগের ব্যাপারেই তারা সচেষ্ট ছিল।

এবার আসা যাক ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরের কথায়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মুসলমান ও মগদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ করার জন্য ত্রিপুরেশ্বরগণ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুকিগণ এত প্রবল হয়েছিল যে, ইংরাজ গভর্ণমেন্টের সাহায্য না পেলে রামগঙ্গা মাণিক্য সপরিবারে

তাঁদের দ্বারা নিহত হতেন।

১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৮খৃঃ) ত্রিপুরেশ্বর তার রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত সুদৃঢ় করেছিলেন। বর্তমান কাছাড় জেলার হাইলাকন্দি ও মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত থাঙ্গম নামক কুকি গ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত বলে ত্রিপুরেশ্বর দাবী করেন। সুতরাং মণিপুর রাজার সহিত ত্রিপুরেশ্বর কলহ উপস্থিত হলে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট মধ্যস্থ হয়ে অনুসন্ধান দ্বারা জানতে পারেন থাঙ্গম খচাক কুকিদের প্রাচীন বাসভূমি এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে ১৬০ মাইল পূর্ব উত্তর কোনে অবস্থিত। মণিপুরের নিকটবর্তী হলেও ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিল। কিন্তু মণিপুর পতি সেখানে একটি থানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাইলাকান্দি পরগণা নিয়ে পূর্বেও কাছাড় পতির সঙ্গে ত্রিপুরার বিরোধ চলছিল। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হাইলাকান্দির দক্ষিণ দিকস্থ সম্পূর্ণ পার্বত্য প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত হিসাবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন। এ খবর পেম্বারটনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

"From the sources of the Juree River along the western band, to its confluence with the Borak; thence south on the western bank of the latter river to the mouth of the Chikoo (or Tipai) nullah, which marks the triple bouundary of Manipur, Cachar and Tripurah, on the south the limits have never been accuratily defined, and we only know that on this side the line is formed by the northern foot of lofty mountains inhabited by the poitoo kookies and by wild and unexplored tracts of territory subject to Tripurah. This densely wooded and mountainous region oppears to commence at a distance of between 40 and 50 milis from the southern bank of the Soorma"

(Pemberton's Report, 1835).

ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব ও উত্তরদিগের পর্ব্বতে ছিল পইতু বংশীয়দের বাস। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে পইতু সরদার শিবদূত ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) কুকি সহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যদিও লুসাইদের কোন কোন সম্প্রদায় তখনও ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার পূর্বক কর প্রদান করত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল লালছোকলা অতর্কিতে শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড় পরগণার কচুবাড়ি নামক গ্রাম আক্রমণ করেছিলেন। এবং সেখান থেকে ২০টি নরমুন্ড ও ৬টি দাস দাসী সংগ্রহ করেন। ইংরেজ গভর্ণমেন্ট সে খবর পেয়ে ত্রিপুরার মহারাজকে তাঁদেরকে ধৃত করবার জন্য লিখলেন, মহারাজ একজন দারোগাকে ১০ জন বরকান্দাজের সঙ্গে লালছোকলাকে ধরে আনবার জন্য পাঠালেন। এরপর ১লা ডিসেম্বর কাপ্তেন ব্লেকউড লালছোক্‌লাকে ধৃত করার জন্য তার গ্রাম অবরোধ করেন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁকে ধৃত করেন। শ্রীহট্টে লালছোকলার বিচার হয় এবং বিচারে দীপান্তরে তাকে প্রেরণ করা হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যখন কর্ণেল লেষ্টার সৈন্যসহ কাছাড় থেকে লুসাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন কাছাড়ের দক্ষিণ প্রদেশ হতে তার একদল লুসাই শ্রীহট্টের লাতু থানার কয়েকটি গ্রাম লুঠ করে পলায়ন করে। কর্ণেল লেষ্টার কুকি অত্যাচার দমন হেতু ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য জেলা সৃষ্টি করেন এবং সেখানে একজন ইংরাজ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লুসাইগণ খন্ডলে এক ভীষণ হত্যাকান্ড সম্পাদন করে। সে হত্যাকান্ড সম্পর্কে ইংরেজদের রিপোর্ট ছিল :-

"Early in January 1860 reports were received, in Chittagong, lf assemling of a body of 400 or 500 Kookies at the head of the River Eanny, and soon the tale of burning villages

and slanghtered men gave token the of the work they had on hand, on the 31st January, before any intimation of their purpose could reach us, the Kookis, Ofter sweeping down the course of the Eenny, burst into the plains of Tipperah at Chagabneyab, burnt or plundered 15 villages, butchered 185 British Subjicts, and carried off about 100 Captives."

ঘটনাটি ঘটেছিল এরূপ, খন্ডল পরগণার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া থানার অধীন মুন্সীর খীল গ্রামের বাজারে ত্রিপুরা মহারাজার সেনাপতি কাপ্তেন ধরনী ধর সিংহ কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাস করতেন। ১৬ই মাঘ, শনিবার সেদিন ছিল স্বরস্বতী পূজার দিন। তাই কাপ্তেন ধরণী ধর তাঁর অস্ত্র শস্ত্রাদি পরিষ্কার করে পূজার জন্য সাজিয়ে রাখতেছিলেন। এমন সময় খবর এল ৪০০/৫০০ কুকি নিকটবর্তী গ্রাম আক্রমণ করেছে। খবর পাওয়া মাত্র ধরণী ধর পলায়ন করেন। তখন কুকিগণ নির্বিঘ্নে গ্রামবাসীদের খন্ড খন্ড করে কাটতে লাগল, গৃহে অগ্নি সংযোগ করল যে সকল শিশু মাতার সহিত ছিল, কুকিগণ সেই সকল শিশুকে মাতার বক্ষ হতে কেড়ে নিয়ে শূন্যে তুলে ধরে সুতীক্ষন শেল দ্বারা বিদ্ধ করেছিল। কুকিগণ পুরুষলোকদের নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করে এবং যুবতী মেয়েদের বেধে নিয়ে যায়। এভাবে সেদিন তারা ১৫টি গ্রাম ধ্বংস করে এবং সে সমস্ত গ্রামের সমস্ত সোনা রূপা লোহা যেখানে যাহা পেয়েছিল তা নিয়ে গিয়েছিল। যদিও সে সময় গুনাগাজি নামে একজন প্রধান ব্যক্তি ২৫/৩০টি বন্দুক সংগ্রহ করে বাউনালী নদীর তীরে কুকিদিগকে আক্রমণ করেন। বন্দুক দেখে কুকিরা পলায়ন করে। সেদিন গুনাগাজি সাহস না দেখালে হয়তো আরো গ্রাম কুকিদের হাতে ধ্বংস হতো । সেদিন সে ভীষণ হত্যা কান্ডকে অবলম্বন করে গ্রাম্য কবি রাধামোহন গীতি কবিতা রচনা করেন। কবি বীণাপাণির পদ বন্দনা করে বলছেন।

"শুন সর্ব সাধু ইহার নির্ণয়
যেন মতে খন্ডলেতে কাটাকাটি হয়।
দেখ, মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল
মুন্সী রখীল বাজারে বাবু ধুরন্ধর আছিল।
যেদিন প্রভাতকালে, করেছিল পূজার আয়োজন
চিনি শর্করা আদি যত লয় মন।
পূজা আরম্ভিল, হেনকালে প্রমাদ ঘটিল।
অকস্মাৎ তিপ্রা কুকি আসি দেখা দিল
তারা, দাও শেল হাতে বন্দুক কান্দে দেখতে ভয়ংকর।
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুজঙ্গর
রণে প্রবেশিল, যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়,
অরণিতে কাটা পরি ধূলাতে লুটায়।
রুধির আবেসসিল, আকাশেতে উড়িছে শকুন,
ঘর জিনিষ লুঠ করি, চালে দেয় আগুন।
তারা খন্তা নিল, কুড়াল নিল, আর নিল দাও কাঁচি।
সিন্ধুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাচি।
ঠিক দুপুর বেলা হ'ল পুড়ে মুন্সী বাড়ি
সে দিন ফিরে যায় রাত পোহাল ছিল রবিবার
কাটা গ্রামে কাটি আসি দিল পুনর্বাব।
চৈলেছে কোলা পাড়া
কোলা পাড়া যেতে তারা করেছে গমন।
বাউনালীর কোলে আসি দিল দরশন।
দেখে গুনাগজি এল সাজি সিফাই সঙ্গে করে
তিপ্রা কুকি ফিরাইল বন্দুল আওয়াজ করি।

কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পেয়ে খন্ডলে সৈন্য পাঠান

কুকিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সৈন্য পৌঁছাবার পূর্ব্বেই কুকিয়া জঙ্গলে পলায়ন করে।

খন্ডলের লুসাই কুকিদের আক্রমণের সম্বন্ধে সেদিন ইংরেজ সরকার অনুসন্ধান করে বিবৃতিতে লিখেছেন ঃ-

"It was at first supposed that this extanded movement on the part of these tribes was directed by certain near relatives of the Tipperah Raja, and was intended to involve that chief in trouble with the English Government. But it was ofter wards ascertained with considerable certainly that the main instigators of the invasion were three of four Hill Tipperah refuges, Thakurs who had lived for sometime among the Kookis and who took advantage of the ill - feeling caused by an attack made by the Raja's subjects upon some Duptung Kookis, to excite a rising, that unfortunately became diverted to British territory. Driven by the Raja from his dominions, these men had formed alliances among the various Kooki tribes of the interior and year by year villages, supposed to be frendly to the Raja, had been attacked and plundered, vague rumours of which distrubances had reached our ears. Some of the Raja's own subjicts, moreover, exasperated by constant exastions, were belived to have invited the Kookis to revage his territories."

এই কুকি অত্যাচারে যে সব খন্ডলবাসী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, ইংরেজ সরকার তাদেরকে ১৩০০৭ টাকা ক্ষতিপূরণ দেন। এই টাকার

অর্ধেক ত্রিপুরা মহারাজা দেন।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে (১৮৬২খৃঃ) কুকিদের দ্বারা শ্রীহট্টের অন্তর্গত আদমপুরে যে হত্যাকান্ড সাধিত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। আদমপুরের হত্যাকান্ডের সময় কুকিগণ যে সকল স্ত্রীলোক ধরে নিয়ে আসে, তাদের মাঝে কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক কাছাড়ে পলায়ন করে, বাকী স্ত্রীলোকদের কুকিরা বিবাহ করে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে লেপ্টেনান্ট গভর্ণর সার জর্জ কেম্পবল পূর্ব্ব সীমান্তে শান্তি স্থাপনের জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে লিখলেন। তখন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই শীত ঋতুতে একটি সামরিক অভিযানের আদেশ জারি করেন। এই অভিযানে ত্রিপুরা ও মণিপুরের উভয় রাজাই সাহায্য করবে। উক্ত অভিযান পরিচালনা করবে চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার লেউইন সাহেব এবং কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার এড্‌গার সাহেব।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাছাড় ও চট্টগ্রামের দু'টি সেনাদল এসে পৌঁছল। চট্টগ্রামের সেনাদলের নায়ক ছিলেন জেনারেল ব্রাউনালো এবং কাছাড় সেনাদলের নায়ক ছিলেন জেনারেল বোরসিয়ার।

উল্লিখিত দু'টি সেনাদলের সঙ্গে যে সকল সার্ভে অফিসার ছিলেন, তাঁরা চট্টগ্রাম ও কাছাড়ের মধ্যবর্তী ৬৫০০ বর্গমাইল ভূমির মানচিত্র তৈরী করেন।

ত্রিপুরার পলিটিকেল এজেন্ট পাউয়ার সাহেব সার্ভেয়ারদের সঙ্গে পরিভ্রমণ করে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে নির্দ্দেশিত করেছিলেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিলের পত্রে লিখেছিলেন ঃ-

"The territory over which the Raja has a bonafide nominal control is bounded on the east by a range of hill running southward from

chatter choora to Sorphul peak, and from thence in a zig-zag line to surdaing, on the east of this line, the Lushai land Commences, and on the west there is much uninhalited and un-explored jungle. "

পাওয়ার সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী সুকপাইলাল ও অন্যান্য খচাক কুকিদিগের বাসভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা থেকে পৃথক হয়েছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের স্যার রিচার্ড সেম্পল পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একজন পলিটিকেল অফিসার নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। যার অধীন সমগ্র কুকি প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যে থাকবে। কিন্তু আসামের চীফ কমিশনার কিটিঞ সে মতের বিরোধীতা করে আগরতলায় পলিটিকেল এজেন্ট রাখার প্রস্তাব করলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে একদল কুকি চাংশিল বাজার লুণ্ঠন করেছিল। এই লুণ্ঠনের খেসারত স্বরূপ কুকি সর্দ্দার সুকপাইলালকে এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল ইংরেজ সরকারকে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুকপাইলালের মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন চীন লুসাই অভিযান হয়েছিল তখন ব্রহ্মদেশ হতে একদল, চট্টগ্রাম হতে একদল এবং কাছাড় হতে একদল সৈন্য কুকি প্রদেশে প্রেরিত হয়েছিল। সেই অভিযানে কুকিদিগকে পরাজিত করে তাদের নিকট হতে অনেক বন্দীকে মুক্ত করা হয়েছিল। এরপর ইংরেজ সরকার কুকি প্রদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে 'উত্তর লুসাই' ও 'দক্ষিণ লুসাই' নামে দু'টি জেলার সৃষ্টি করেন। সেদিন সে দু'জেলার পরিমাণ ছিল ৪০০০০ বর্গমাইল।

মার সাহেব প্রথমে দক্ষিণ লুসাই জেলার শাসন ভার গ্রহণ করেন। তারপর তিনি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারের পদে নিযুক্ত হলে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পয়লা মে তারিখে ক্যাপ্টেন

সেক্সপিয়ার সেখানের শাসন কর্তা নিযুক্ত হন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে ক্যাপ্টেন ব্রাউন উত্তর লুসাই জেলার পলিটিকেল অফিসার হয়ে আজিয়াল দূর্গে গমন করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে ক্যাপ্টেন ব্রাউন সৈরং থেকে চাংশীল গমন করছিলেন। সহকারী হিসাবে ছিলেন তার নিজস্ব কেরানী কামিনী কুমার সেন, একজন দফাদার ও দুইজন পুলিশ এবং কিছু সংখ্যক কুলি। পথিমধ্যে কুকিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সবাই নিহত হন। এই হত্যাকান্ডের পর আসামের চিফ্ কমিশনার ও গভর্ণর জেনারেল তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাসন দ্বারা চিরদিনের জন্য কুকি অত্যাচার দমন করেন।

আজকে যাদেরকে আমরা মিজো বলি তারাও লুসাইয়ের একটি শাখা। ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড়ে যারা বাস করে তাদেরকে আমরা মিজো বলে থাকি।

ত্রিপুরাকে আসামের মিজো পাহাড় জেলার আইজল মহকুমা থেকে পৃথক করেছে লঙ্গাই নদী। ত্রিপুরার পূর্ব্ব সীমানার নিকট লঙ্গাই নদীর পশ্চিম পারের দামছড়া থেকে আরম্ভ হয়েছে জম্পুই পাহাড় এবং সেখান থেকে দেও নদীর পারের কাঞ্চনপুর উপত্যকায়। জম্পুই পর্ব্বত শ্রেণী উত্তর দক্ষিণে লম্বা আর পূর্ব্ব পশ্চিমে চওড়া। জম্পুই পর্বত শ্রেণী লম্বায় প্রায় তিরিশ মাইল এবং চওড়ায় এর ঢালু অংশ নিয়ে প্রায় দু'মাইল হবে। সুতরাং এর পরিমাণ হবে ৬০ বর্গমাইল। উত্তরে আসাম আগরতলা রোডের কিছু দক্ষিণে সে আরম্ভ হয়েছে, আর দক্ষিণে প্রায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে ছুঁয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বতন মহকুমা ধর্মনগরের দক্ষিণাংশ জুড়ে রয়েছে দামছড়া থানার জম্পুই পাহাড়ের ও কাঞ্চনপুর উপত্যকার পাহাড়ী ও অর্দ্ধ পাহাড়ী গ্রামগুলি।

জম্পুইর অধিবাসীরা প্রায় সকলেই জাতিতে মিজো। মিজোদের ভাষায় 'মি' মানে লোক আর 'জো' মানে পর্ব্বতশীর্ষ এবং এই 'মি'

ও 'জো' একত্রে দাঁড়ায় মিজো আর বুঝায় পর্ব্বত শীর্ষের অধিবাসী। এ জন্যই সেদিন লঙ্গাই নদীর পূর্ব্বপারের লুসাই হিল জেলার মিজোদের আপত্তির ফলে জেলাটির নূতন নামকরণ হয়েছে মিজো হিল জেলা।

ক্যাপ্টেন সেক্সপীয়ার তাঁর গ্রন্থে সেখানকার অধিবাসীদের বলেছিলেন লুসাই কুকি জাতীয়। সেই থেকে অ-মিজোদের নিকট মিজোরা লুসাই নামে পরিচিত। মিজোদের ভাষায় কুকি মানে শিং এবং অতীত কালে মিজো ও অন্যান্য কুকিরা শৃঙ্গ সমন্বিত টুপি পরতো কিন্তু তা কুকিরা 'কুকি' বলতে বুঝত মস্তক শিকারী । মিজোদের ভাষায় 'লু' অর্থ হচ্ছে শির, আর 'সেই' অর্থ বড়।

মিজোরা অনেকগুলি উপজাতিতে বিভক্ত। যেমন লুসাই, মার, রংরাইতে, জাংতে, রাখমে, সাইলো, জদেং, থাংলিয়া, রিবোং 'রাংখম' পাঁচুহীন, শিয়াক, কলনে, তাংজিরা ইত্যাদি। মিজোদের মধ্যে অনেকগুলি কথ্য ভাষা আছে। তার মধ্যে লুসাই ভাষাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, মিজোদের কোন ভাষারই নিজস্ব বর্ণমালা নেই। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকেরা লুসাই ভাষাকে রোমান হরফে ট্রেন্সলিটারেশন বা উচ্চারণ অনুসারে অক্ষরীকরণ দ্বারা মিজো অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচলন করেছেন। মিজো ছেলে মেয়েরা রোমান হরফে লুসাই ভাষার ইতিহাসে ভুগোল অধ্যায়ন করে, লুসাই ভাষায় 'x', 'y' ও ' a' এর ব্যবহার নেই।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিজোরা আসামের বর্তমান মিজোহিল জেলার এলাকায় ও তার আশে পাশে বাস করতো এবং বহু সংখ্যক স্বাধীন সর্দ্দারের দ্বারা শাসিত হতো। তখনকার দিনে এদের ধর্ম ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রন জাত। তারা জুম চাষের মাধ্যমে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতো।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী একদল মিজো শিলচলের নিকটবর্তী সে সময়কার আলেকজান্ডারপুরের একটি সাহেবী চা বাগান আক্রমণ করে, সে বাগানের ম্যানেজার মিঃ উইন চেষ্টারকে হত্যা করে তার কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তখন ব্রিটিশ

সেনাবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল টি এইচ লিউলিন মিজোদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন এবং মিজো এলাকাকে বৃটিশ শাসনে আনেন। এবং ধীরে ধীরে সেখানকার অধিবাসীদিগকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সাখানের সর্দ্দার বৃদ্ধ লালডিঙ্গা রিবোং এর পিতা মিজো সর্দ্দারদের মধ্যে সর্ব প্রথম ত্রিপুরায় আসেন। তারপর আসেন শেরমুনের সর্দ্দার। উত্তর জম্পুইতে আসেন রাজা বাহাদুর দাওচুমা । তিনি আসামের মিজোহিলের একটি নাবালক সর্দ্দারের অভিভাবক ছিলেন। সেখান থেকে কিছু কাল পর একদল সমর্থক নিয়ে ত্রিপুরার উত্তর জম্পুইতে চলে আসেন এবং বেলয়িানচিপকে রাজধানী করে উত্তর জম্পুইর রাজা বাহাদুর বনে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এল হুয়াপলিনা বেলিয়ানচিপের রাজা হন।

দক্ষিণ জম্পুইর সর্দ্দার ছিলেন রাজা ফ্রাং । তাঁর রাজধানী ছিল ফুলতংসই । দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব্বে এই সব রাজারা ত্রিপুরার মহারাজার নিকট সর্দ্দার বলে স্বীকৃতি ছিল এবং তারা নিজ নিজ এলাকায় পরিবার প্রতি ৫ টাকা হারে বার্ষিক রাজস্ব আদায় করতেন। কিন্তু ত্রিপুরা ভারতভূমি হবার পর এসব নিয়ম।

নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে লুসাইয়া কিরাত বা লৌহিত্য জাতি। অন্যান্য পার্বত্য জাতি থেকে এদের বর্ণ কিছুটা মলিন, নাসিকা উন্নত, ঠোঁট পাতলা, কিন্তু মুখ অন্যান্যদের মত চাপা নহে। অনেকের ধারণা বাঙ্গালী রমনীদের সংযোগ এদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। এ সম্পর্কে ক্যাঃ লেউইন তার গ্রন্থে লিখছেন যে -

"They differ entirely from the other hill tribes of Burman of Arracandes orgin, in that their faces bear no marks of Tatar or Mongolian descent. They are swarthy in compexion and their cheeks are generally smooth among the Howlong tribe. However, one meets many

men having long bushy beards. I should be inclined to allribute this to a mixture of Bengali blood, from the many captives they have from time to time carried away." (Hill Tracts of Chittagong)

লুসাইদের একতা এবং সমাজ বন্ধন প্রশংসীয়। কেহ যদি সামাজিক কোন নীতি লঙঘন করে তবে সমাজের নিকট তাকে শাস্তি পেতে হয়। তাদের প্রতি সম্প্রদায়ের রাজা বা সর্দ্দার থাকে। কিন্তু কোন সমাজের অধিপতিই অন্যান্য সমাজের অধিপতিকে না জানিয়ে কোন নূতন নিয়ম গ্রহণ করতে পারেন।

তাদের ঘর তৈরী হয় সাধারণতঃ বাঁশ ও কবত দ্বারা। বাঁশের পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেন, ঘরের ভিটগুলিও বাঁশের মাচা তৈরী করে ঢেকে দেয়। তাদের ঘরগুলি প্রশস্ত থাকে। তাতে বহু লোক বাস করে। এরা গভীর বন কেটে আগুনে পুড়িয়ে সে স্থান শুষ্ক করে নানাবিধ শষ্য বীজ উৎপাদন করে।

লুসাইরা শাক সব্জী থেকে মাংস খেতেই বেশী ভালবাসে । তাদের রান্নাতে কোন মসলা ব্যবহৃত হয় না। লুসাই রমনীরা পুরুষ থেকে অধিক স্বাধীন। তাদের রমনীরা সাজ পোষাক পরতে ভালবাসে।

তাদের কেশ চর্চা আকর্ষণীয়, গলায় বিভিন্ন প্রস্তর দ্বারা রচিত মালা, হাতে হাতীর দাঁতের বা মহিষের শিং এর প্রস্তুত চুড়ি ব্যবহার করে। রমনীরা গম্ভীর প্রকৃতির। ব্যভিচার তাদের মধ্যে খুব কম । সামাজিক নিয়মের কঠোরতাই তাদেরকে ব্যভিচার থেকে মুক্ত করেছে। অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার খুব বেশী দোষের নয়। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী কিংবা পুরুষ অন্যের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এবং প্রকাশ পেলে সমাজের নিকট তাদের কঠোর দন্ড ভোগ করতে হয়। অবিবাহিত যুবক - যুবতীর মধ্যে যদি প্রণয়ের সৃষ্টি হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ হয়, কিন্তু যদি পরস্পরের মধ্যে কিছুটা আত্মীয়তা সূত্র থাকে তবে সামাজিক দিক থেকে বিবাহ হতে পারে না - যদি হয়

তবে তা অসিদ্ধ বিবাহ বলে পরিগণিত হয়। বিবাহে কোন ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান হয় না। ভোজ এবং মদ পানই বিবাহে উৎসবের প্রধান অঙ্গ। বিবাহ হয়ে গেলে সহজে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু কোন কারণে একজন আরেকজনকে পরিত্যাগ করতে চাইলে সে বিষয় সমাজে উত্থাপন করতে হয়। তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যারা অপরকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা প্রবল তাকেই ভোজ এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হয় সমাজকে।

লুসাইগণ নিরীশ্বরবাদী নয়, অথচ কোন নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজাও তারা করে না। বর্তমানে এরা বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে যুক্ত খ্রীষ্টান রয়েছে। কিন্তু জম্পুই পাহাড়ের লুসাইরা সকলেই নিউজিল্যান্ড চার্চের অধীন প্রটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান। তাদের নিজেদের আনন্দ উৎসবের দিনে নিউজিল্যান্ড থেকে তাদের জন্য আসে ফল, কাপড় প্রভৃতি উপহার হিসেবে। এদের বর্তমান জাতীয় পোষাক হল মেয়েদের 'পোয়াং' বা বাইরের পোষাক 'কনকেন' বা মাগড়া আর 'কর' বা ব্লাউজ। ছেলেদের হল 'কর' বা পোয়াং। এদের অধিকাংশ লোকেরাই মশারী ব্যবহার করে না। রাত্রে নিদ্রা যাবার সময় 'পুনপুই' নামীয় খেস জাতীয় চাদর ব্যবহার করে।

জম্পুই হিলের লুসাই ছেলেরা বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার জন্য নিউজিল্যান্ড, গৌহাটি, শিলং ও আইজলে যায়। বাকী কিছু সংখ্যক ত্রিপুরা মিজোরাম কলিকাতায় যায়। বর্তমানে লুসাই যুবক যুবতীরা 'টেডিবয়' মার্কা চুলের ছাট ও মেয়েরা মঙ্গো য়ুরোপীয় ধাচের 'বব' অধিকাংশের মধ্যেই দেখা যায়।

কুমারী মেয়ের অবৈধ সন্তানের ওদের সমাজে স্বীকৃত আছে। সম্ভাব্য পিতাকে জরিমানা স্বরূপ মেয়ের পিতা মাতাকে ৪০/৫০ বা ততোধিক টাকা দিতে হয়।

জন্মের পরেই হয় এদের হয় নামকরণ বা খ্রীষ্টোৎসব। পনের বছরের সময় হয় ব্যাপটিজম্। এর পর হল ২০/২২ বৎসরে বিয়ের উৎসব।

লুসাইদের মাঝে স্বয়ম্বর বিবাহেরও রীতি আছে। সাধারণতঃ কিশোর কিশোরীদের অবাধ সান্ধ্য মেলা মেশা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে 'রীম' নামক সামাজিক অনুষ্ঠানে। ক্রমশঃ এ মেলামেশার এক একটি দল গিয়ে দাঁড়ায় একটি মেয়েকে নিয়ে কতিপয় ছেলের মেলামেশার দলে, আর একেই লুসাই বা মিজোদের ভাষায় বলে 'রীম'। সন্ধ্যাবেলায় মেয়ের বাড়িতে কিছু সংখ্যক ছেলে আসে এবং সম্মিলিতভাবে তারা চা ও খাবার খাওয়া, গল্প গুজব করে থাকে। দিনের পর দিন এ সান্ধ্য আসরের প্রধান উদ্দেশ্যই হল মেয়েটির মনোরঞ্জন করা। সকল ছেলেই তার সাধ্য অনুসারে গল্প গুজব উপহার প্রদানের মাঝ দিয়ে মেয়েটির মনে নিজেকে স্থান করে নিতে চায়। কিন্তু মেয়েটি কোনদিন তাদের একজনকে স্বীকৃতি দেবে তা কিন্তু তারা জানতে পারে না। হঠাৎ একদিন সুন্দর রাতে রীমের কেন্দ্রবর্তিনী মেয়েটি তার মনোনয়ন ঘোষণা দেয় এক চমকপ্রদ ভঙ্গীতে। প্রতিদিন আসরে মেয়েটিও ছেলের বাইলো সেবন করে সূতায় বাঁধা কাগজে, কিন্তু এই ফলাফল ঘোষণার দিনে মেয়েটি কেবল মাত্র তার মনোনীত পাত্রের একটি বাইলো নিজের মাথার চুলে বেঁধে দেয়। সেদিন থেকে অকৃতকার্য পাত্রেরা মেয়েটির জীবন পথ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে দাঁড়ায়। তারপর বর কনের পিতা মাতারা বিয়ের আয়োজনে অগ্রসর হয়। এই মনোনয়নের পর মেয়েটি শুধু নির্ব্বাচিত পাত্রটির সঙ্গেই মেলামেশা করতে পারে। রীমের ক্ষেত্রেও প্রাক্-বিবাহ যৌন সম্পর্ককে সমাজে অবাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। অবাক লাগে ভাবতে গেলে 'রীমের' মেয়েকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিফলকাম ছেলেরা তাদের অসাফল্যকে অতি সহজ ও শান্তভাবে গ্রহণ করে, এবং এ নিয়ে কখনও প্রতিশোধ প্রচেষ্টায় ব্রতী হবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

এদের বিয়েতে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষকে পাঁচ ছয় শত টাকা যৌতুক দেয় এবং এই যৌতুকের টাকা কন্যাপক্ষের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিতরিত হয়। মেয়ে ছেলের বাড়িতে তার নিজের হাতের কাজ করা সুন্দর সুন্দর জিনিস পাঠায় পরবর্তীকালে স্ত্রী যদি বিবাহ বিচ্ছেদের চেষ্টা করে তবে সে যৌতুকের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য।

এদের সমাজে বিবাহের মত মৃত্যুকে উপলক্ষ করেও উৎসব

অনুষ্ঠিত হয়। মৃতদেহটিকে নূতন কাপড়ে ঢেকে শবাধারে ঢুকিয়ে স্ট্রেচারে করে গীর্জ্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে গ্রামের গোরস্থানে নিয়ে কবর দেওয়া হয়। কবরের উপরের স্মৃতি ফলকে রোমান হরফে জন্ম মৃত্যুর তারিখ ও অন্যান্য মন্তব্য বা ধর্মীয় শ্লোক লেখা হয়। কবর দেওয়ার পর সাতদিন পর্যন্ত শোক পালন করা হয়। তারপর ধর্মীয় নাচ গানের অনুষ্ঠান করা হয়।

## পাদটিকা

১। রাঙ্গরুঙ্গ - রাজমালা ২য় লহরের টীকায় (৩১৩ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে - 'ইহা লুসাই পর্ব্বতের অন্তর্গত কুকি জাতির বসতি স্থান'। সেখানকার অধিবাসীরাও এই নামেই পরিচিত। রাজমালার ১ম লহরের ৩৭ পৃষ্ঠায় আছে "রাঙ্গরুঙ্গ আদ প্রজা কুকি তথা বৈসে"। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস বিবরণীতে রাঙ্গারুঙ্গীয়াদের 'হালাম' সম্প্রদায়ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের নাম লিখিত হয়েছে লাংলু। ব্রজগোপাল সিংহ প্রণীত 'মণিপুরী ও কুকি ভাষা শিক্ষার সহজ উপায়' গ্রন্থে কুকি ভাষায় 'হালাম' এর প্রতিশব্দ লিখিত হয়েছে 'রাংলাং'।

হালামেরা সাধারণতঃ 'বার হালাম' বলে কথিত হয়। সেকালে বহু অর্থে বার ব্যবহৃত হতো।.১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের ত্রিপুরার সেন্সাস বিবরণীতে কলই খলুং বা কুলু, কর্ব্বং, কাইপেং, কৈরেং, চড়ই, ডাব, খাংচেপ বা খাঙ্গচেপ, সাকচেপ বা সাকাচেপ, নবীন, বংশেল, মুরছুম, রাংখল, রূপিনী, লাঙ্গই, লাংলুং এই ১৬টি দফায় হালামের উল্লেখ আছে।

২। "ত্রিপুরার অধিকার রাঙ্গরুঙ্গ পালে। তাতে বরাক নৈর ছায়া কালে পর্ব্বতত আমার এখের নগা ডফলা যেনে তেনে বিধ মানুহ থাকে যিহঁতক কুকি বোলে তাতে তরব মান মানুষ থাকে। যিহঁতর অস্ত্র - কাঁড়, ধনু, বারু, নগাযাঠি। তারা অধিকার পাতি ত্রিপুরার রাজা এটাক দিত, তাক হালা মগা বোলে। আমার এখের নগার খুনবাউ যেনে তেনে। তারে তলে থাকে গালিম ১, গাবোর ১, ছাপিয়া ১, দিল

১। ..... পাঁচে তার পরাগৈ ৪ দিনে রূপিনী পাড়া পালে। ..... তাতে রাঙ্গরুঙ্গিয়া যেতে তেনে বিধ কুকি মানুহ আছে। ..... রাঙ্গরুঙ্গরে পরা ছাইরাঙ্গচুক সীমা করি যি মানুহ আছে ইহঁতক কুকি বোলে। ''

হালামরাও বলে যে, 'হা' (মাটি বা দেশ) এবং 'লাম' (পথ) রক্ষার কাজ করতো বলে তাদের নাম হালাম হয়েছে।

৩। ত্রিপুরা বুঞ্জীতে আছে 'বৎসরি রাজরুঙ্গীয়া' - এ ত্রিপুরার রাজালৈ দিব লাগে, - মোঁরা ১টা সোনা, হাতীর দাঁত, কাঁহী জালুক, খেচকাপড়, কপাহ মেঠন .....। রাঙ্গরুঙ্গরে পরা ছাইরাঙ্গচুক সীমা করি যি মানুহ আছে ইহতক কুকি বোলে। তৈজল, কুমগাঙ্গ স্বাইরাঙ্গচুক এই চারি ঠাঁইর মানুহে ত্রিপুরা রাজাকে বৎসরি দিএ - হাতী দাঁত মেঠন, খেছ কাপর, জালুক, কপাহ।''

৪। ''হেন কালে উপদ্রব পূর্ব্বকুলে হৈল
বঙ্গপাড়া থাকি সবে সমাচার পাইল।
খুচুং, দফা এক এক কুকি লুচি দফা আর
যে সব না থাকে অধিকারে ত্রিপুরার।
তারা আসি পূর্ব্বকুলে দস্যুবৃত্তি করি।
মনুষ্য মারিয়া ধন লৈয়া যায় হরি। ''
'কৃষ্ণমালা'।
খুচুং কিরাত বাস করয়ে যেখানে
লুচি দফা কুকি থাকে তাহার দক্ষিণে ।
'রুফনী নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ
তথাতেহ বসতি করায়ে কুকিগণ।
কাঙ্গলাই নামে এক পর্ব্বতের শৃঙ্গ
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাখে ।

ঐ সব স্থানেতে বৈসে যত কুকি চর
পূর্ব্ব কুলিয়া কলি তা সবারে কয়
- কৃষ্ণমালা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ত্রিপুরার রাজা রাজধর

মাণিক্যের (১৭৮৫-১৮০৪) আদেশে 'কৃষ্ণমালা' রচিত হয়েছিল।

৬।"..... The Lushais are a cross between Kookies and Burmese, and this opinion is strengthened by the belief universally prevalent, that, a part of the Burmese army which occupied Telyne and its neighbourhood in 1824 never returned to Ava, but settled in the jungle to the south of Cachar." - (N.E.F. of Bengal, p.293)

কিন্তু এ উক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই লুসাই নামটি ত্রিপুরায় পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যুবরাজ কৃষ্ণমণি বঙ্গপাড়ায় থাকাকালে খবর পেয়েছিলেন যে,

'খুচুং দফা এক কুকি লুচি দফা আর
সে সব না থাকে অধিকারে ত্রিপুরার।'
কৃষ্ণমালা।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ১৭৮৫ থেকে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকালে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। লেঃ কর্ণেল সেক্সপীয়ার লিখেছেন ঃ-

"Thangura must have been lived early in the eighteenth century, এ উক্তি কৃষ্ণমালার উক্তির সমর্থক।

৭। লুসাইদের সৈন্যদলে লুসাই ছাড়াও কিছু সংখ্যক খাঁটি বর্মি (যারা কাজের সন্ধানে আগত) এবং মণিপুর ও ব্রিটিশ এলাকার বাস্তুত্যাগী দস্যু শ্রেণীর লোকও ছিল।

৮। সুকপিলালের পিতার নাম মংপে। তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন ধলেশ্বরী ও তার শাখা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত

Ryesa নামক পাহাড়ে। গ্রামটি ধলেশ্বরীর পশ্চিমে হলেও সোরফুয়েল শৃঙ্গের অনেক দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই সোরফুয়েল শৃঙ্গটিকেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট ধরে নেবার পক্ষপাতী হয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য, চট্টগ্রাম ও তথাকথিত লুসাই দেশের সম্মিলিত সীমা বলে। সুকপিলালের আরও দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল হাইলঙ্গ, সাইলো ও সেঙ্গুরা।

সেকালের সরকারী কাগজপত্রে যে ভূমিকে লুসাই ল্যান্ড, লুসাই ক্যান্ট্রি ও সুকপিলালের কান্ট্রি বলে উল্লেখ করা হতো তার পশ্চিমের সীমা লুসাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। কথিত লুসাই ল্যান্ড ও লঙ্গাই নদীর মধ্যে সুকপিলালের প্রভাব বহির্ভূত এবং ত্রিপুরার রাজার শাসনাধীন বিস্তৃত অঞ্চল ছিল। মেকেঞ্জী সাহেব তাঁর N.E.E. of Bengal গ্রন্থে লিখেছেন -

"He (Sukpilal) says himsilf that he has no influence west of the range on which chatter cheora is situated."

ছাতের ছড়া রেঞ্জ দক্ষিণ দিকে যে তিনটি পাহাড় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে তার সবগুলিই ধলেশ্বরীর পশ্চিমে। সেগুলির নাম হাচিক (Hachik) আইন কুঙ্গ (Ainkung) ও রুলপুই। সুকপিলালের আধিপত্য এই তিনটি পাহাড়ের উপর বিস্তৃত ছিল না এবং ধলেশ্বরীর পশ্চিম অঞ্চলে, সোরফুয়েল শৃঙ্গের উত্তরের লুসাইদের সাথে ব্রিটিশ সৈন্যের কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। এই অঞ্চল সেকালে প্রধানতঃ পাইতু ও ডারলং কুকিদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।

৯। চিলিংরা বাস করতো লুসাইদের সর্ব্ব দক্ষিণের গ্রাম থেকে সাতদিনের পথ দূরে। দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে। এই অঞ্চলের লোকদের লুসাইরা বলতো পোঙ্গ। এরা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। তাদের দেহও হতো সবল সুগঠিত। দেখতে তারা মোটেই কুকিদের মত ছিল না। তারা বন্দুকনিয়ে যুদ্ধ করতো। সেসব বন্দুকের টিপকলে ছিল G.Alton খোদাই করা। এদের কাছ থেকেই লুসাইরা

আমেরিকান বন্দুক সংগ্রহ করতো । একজন সাড়ে চার ফিট লম্বা দামের বিনিময়ে দু'টো বন্দুক পাওয়া যেত।

## গ্রন্থপঞ্জী


১। A Statistical Account of Bengal Vo I.vi
By –W.W. Hunter

২। Hill Tract of Cittagong and the dwellers there in 1869, Calcutta.
By – Lewin capt. T.H.J.

৩। Lushai – Kukiclan.
By – Lt. Col. Shakespear.

৪। Descriptive Ethnology of Bengal
By – E.T. Datton.

৫। British Relations with the Hill tribes of Assam. Since 1858. Calcutta. 1964.
By – B.C. Chakraborty.

৬। The Kukis of Tripura.
By – Ram Gopal Singh. M.A. 1978.

শ্রীরাজমালা (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড) - কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
রাজমাল - কৈলাস চন্দ্র সিংহ
১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের সেন্সাস বিবরণী - সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ